ISSN 1813-0372

বর্ষ : ৬ সংখ্যা : ২৪
অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০১০

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৬, সংখ্যা : ২৪

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০১০

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৭১৬০৫২৭

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭ ২২০৪৯৮, **বিপণন বিভাগ** : ০১৯১৬-৫৯৪০৭৯
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
Web : www.ilrcbd.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা।

প্রচ্ছদ : আন-নূর

কম্পোজ : এম. হক কম্পিউটার্স,
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা।

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam. General Secretary. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 100 US $ 5

সূচিপত্র

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৪, পৃষ্ঠা ৫-৮

সম্পাদকীয়

আইনবিরোধী কাজ রুখতে হবে আইনের সাহায্যে

আল্লাহর দুনিয়ায় আইনের রাজত্ব। এ বিশাল সৃষ্টিজগতে জলে স্থলে মহাকাশে যেখানে যা কিছু আছে মহাশূন্যে সঞ্চরমাণ সুবিশাল গ্রহ-নক্ষত্র থেকে শুরু করে জমিনে বিচরণশীল ক্ষুদ্রতম কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত সবাই আইনের অধীন। প্রাকৃতিক আইন কেউ অমান্য করে না। আইন ভঙ্গ করার বা আইন এড়িয়ে চলার সাহস ও প্রবণতা কারোর নেই।

অথচ আমরা দেখতে ও উপলব্ধি করতে পারছি, তারা প্রত্যেকে এক ও একাধিক দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে কেউ গাফলতি করছে না। ফলে একটা শৃঙ্খলা সর্বত্র বিরাজ করছে। আইন ও শৃঙ্খলা দুটো একসাথে জড়িত। একসাথে চলে। আইন যেখানে থাকে সেখানে শৃঙ্খলা থাকে। শৃঙ্খলা নেই মানে আইন নেই।

অথচ আমরা মানুষ সৃষ্টিজগতের বুদ্ধিমান জীব। আমরা বুদ্ধির বড়াই করি এবং ব্যাপক চর্চা করি। আমরা বিশৃঙ্খলার মধ্যেও আইনের অস্তিত্ব অটুট দেখি। সারা বিশ্বে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা। অথচ আমরা আইনের দোহাই দিয়ে ও আইনের জয়গান গেয়ে যাচ্ছি। যা কিছু জুলুম-নিপীড়ন, শাসন-শোষণ, প্রতারণা করছি আইনের নামে আইনের ছত্রছায়ায়। আমরা যেন আইনকে পায়ের ভৃত্যে পরিণত করেছি।

আইনের সাথে সরাসরি জড়িত তিনটি প্রতিষ্ঠান : আইন পরিষদ, প্রশাসন ও বিচার বিভাগ।

আইন পরিষদ দেশ ও দেশের জনগণের চাহিদামতো আইন প্রণয়ন করে। যদি সেই আইন পরিষদ জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধিত্বশীল হয়, তাহলেই এ চাহিদা পূরণ হবে। এটা নির্ভর করছে গণতান্ত্রিক এবং স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচনী ধারার ওপর। এক সময় রাজার কথাই হতো আইন। এখনো যদি লোকদেখানো গণতন্ত্র এবং দুর্নীতিতে কলুষিত নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত আইন পরিষদ হয় তাহলে সেখানেও প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টের কথা ও ইচ্ছাই আইন হয়ে যেতে পারে। কারণ তাঁরাই

হয়ে দাঁড়ান দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতার জনক। এ হিসেবে তাদের পক্ষে স্বেচ্ছাচারিতার জন্ম দেয়া মোটেই কঠিন হয় না। স্বেচ্ছাচারী সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছে বিরোধী দলের হাজার প্রতিবাদ ও প্রচেষ্টা ব্যর্থতার গ্লানি ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারে না। এভাবে জনগণের রায়ে গঠিত একটি পার্লামেন্ট ও আইন পরিষদ দেশ ও জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সঠিক আইন প্রণয়ন করতে পারে না।

এতকিছুর পরও যদি এই আইন পরিষদ ও পার্লামেন্ট জনগণের চাহিদামতো কোনো আইন প্রণয়ন করে তাহলে তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করে দেশের প্রশাসন বিভাগ। এ বিভাগটি রাষ্ট্রের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনার মূল দায়িত্বশীল। প্রশাসন চলে মন্ত্রিসভার অধীনে। আর মন্ত্রিসভা তাদের কার্য সম্পাদন করে একদল আমলা ও বিভাগীয় কর্মকর্তাদের মাধ্যমে। মন্ত্রীগণ জনগণের ভোটে নির্বাচিত। কাজেই জনগণের চাহিদা মেটানোর একটি ইতিবাচক দিক থাকাই এখানে স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের নির্ভর করতে হয় বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আমলা ও বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ওপর। তারা যদি সৎ, সত্যনিষ্ঠ, চরিত্রবান ও সুশাসক হন তাহলেই এক্ষেত্রে কিছু আশা করা যেতে পারে।

প্রশাসনের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করে পুলিশ বিভাগ। এ বিভাগের যারা ইনচার্জ ও কর্মকর্তা তাদের মানসিক গঠন ও প্রস্তুতি এবং দক্ষতা, পারদর্শিতা ও কর্মতৎপরতার ওপর এর সফলতা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। পুলিশকে শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলা হয়। আর শৃঙ্খলা আসে আইনের মাধ্যমে। কাজেই আইন ও শৃঙ্খলা উভয়ের প্রয়োগ ও সফলতা আসে প্রাথমিক পর্যায়ে পুলিশের হাত দিয়ে। তাই আইন প্রয়োগের দৃষ্টিতে পুলিশের দায়িত্ব কী পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ তা সহজেই অনুমান করা যায়। এজন্য বলা যায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় পুলিশকে হতে হবে পূর্ণ দায়িত্বশীল, চরিত্রবান, ঈমানদার, সৎ ও সচেতন কর্মনির্বাহী। পুলিশের ঈমানদারী ও সততার ওপর আইন পরিষদের সফল কর্মসম্পাদন নির্ভর করে। পুলিশ যদি চায় কোনো আইনের বিকৃত প্রয়োগ তাহলে কে তা রোধ করবে? কারণ তারাই তো প্রয়োগকারী সংস্থা। তাহলে পুলিশকে কি পর্যায়ে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ হতে হবে তা আর কারোর বুঝতে বাকি থাকে না। এ পর্যায়ে আইন প্রণয়নের পরে তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আইন প্রণয়নের পরে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার সফল প্রয়োগ। এক্ষেত্রে আদালত বা বিচার বিভাগ সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। বিচার বিভাগের আসল দায়িত্ব আইনের ব্যাখ্যা দেয়া, যাতে তার সঠিক ও সফল প্রয়োগ সম্ভব হয়। বিচার বিভাগ আইন প্রণয়ন করতে পারে না। আইন প্রণয়নের সর্বময় দায়িত্ব জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল আইন তথা আইনপরিষদের। এক্ষেত্রে আল্লাহর আইন ও মানুষের তৈরি আইনের

মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ আইনের মূলনীতিগুলো তৈরি করে দিয়েছেন। এরই ভিত্তিতে মুসলিম জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল মজলিসে শূরা দৈনন্দিন জীবন যাপন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার জন্য আইন প্রণয়ন করে। এভাবে খুলাফায়ে রাশেদার আমলে ঈসায়ী সপ্তম শতকে আইন প্রণীত হয়েছে এবং তার পরেও এগুলো এখনো এদের পূর্ণ কাঠামোয় মজুদ আছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের অধীনে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যে আইনগুলো প্রণীত হয়েছে সেগুলো রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত হয়েছে। বাকি ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পর্যায়ে যেসব আইন প্রণীত হয়েছে, সেগুলো 'ফিক্‌হ' নামে অভিহিত হয়েছে। সেগুলোও হাজার হাজার গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ আছে। সেগুলো থেকে যখনি যে কোনো সরকার যেসব আইন গ্রহণ করেছে সেগুলো রাষ্ট্রীয় আইন ও ইসলামী আইন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

অন্যদিকে মানুষের তৈরি আইন মানুষের নিজস্ব বিচার-বিবেচনাপ্রসূত এবং নিজস্ব উদ্ভাবনী ক্ষমতার ফসল। এর মূলনীতিগুলো মানুষ নিজেই তৈরি করে আবার নিজেই করে এগুলো পরিবর্তন। তাই এখানে কোনো চিরন্তন ও অবিসংবাদিত সত্য নেই। স্থান-কাল-পাত্রের সাথে এগুলো পরিবর্তিত হয়। মানুষের সমাজ ভাঙাগড়ার ক্ষেত্রে এ আইনগুলো গভীর থেকে গভীরতর প্রভাবের অধিকারী। মুসলমানরাও আজ এ আইনের প্রভাববলয়ে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাই মানুষের গড়া আইনের অধীনে বিশ্বব্যাপী অমুসলিম সমাজে যে নৈতিক ও চারিত্রিক অবক্ষয় ও ধ্বংস নেমে এসেছে, তার একটা অংশ মুসলমানদেরকেও স্পর্শ করেছে। তবে ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও ইউরোপীয় সভ্যতার বিজয়ের পূর্বে মুসলিম সমাজের হাজার বছরের ইসলামী আইনের প্রভাবে এখনো তাদের সমাজ অমুসলিমদের তুলনায় বেশ কিছুটা উন্নত ও নিরাপদ পর্যায়ে অবস্থান করছে। এখানে যতটুকু ভাঙন ও ধ্বংস এসেছে তা ইসলামী আইন পরিত্যাগ করে মানুষের গড়া আইন গ্রহণের বিষাদময় পরিণতি।

আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রকাঠামো ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাকে এ দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে। আমাদের দেশে বর্তমানে আইনের মূল্য ও মর্যাদা অনেক কমে গেছে। এখানে কেবল আইন নয়, বিচারকেরও মর্যাদা কমিয়ে দেয়া হচ্ছে। রায় বিপক্ষে যাওয়ায় আদালত ভাঙচুর করা হচ্ছে। বিচারপতিদের অপদস্থ করা হচ্ছে। এখানে নির্বিচারে হত্যা হচ্ছে। জালিয়াতি, ছিনতাই, সন্ত্রাস, মানুষকে জিম্মি রেখে হত্যার ভয় দেখিয়ে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। আমাদের অভিধানে চুরি ও ডাকাতি অতি প্রাচীন শব্দ, আধুনিককালে রাতের অন্ধকারে চুরি নয়, দিনের আলোয় পুকুরচুরি, দেশের ও জাতির পুরো সম্পদ চুরি, একটা জ্বলজ্যান্ত জাতিকে একেবারে পথে বসিয়ে দেয়া– এটা হচ্ছে দেশের যারা পরিচালক, যারা দেশের সম্পদের হর্তাকর্তা বিধাতা তাদের দ্বারা। এখানে আইন যেন একটি যন্ত্রচালিত প্রতারণা ও প্রহসন। কথাটি অন্যভাবে

বলা যায়, আইনের সাহায্যে আইনবিরোধী কাজ করা হচ্ছে। অথচ আমরা আইনের পায়রুবি করতে চাই। আইন মেনে চলতে চাই। আইনের মর্যাদা উন্নত করতে চাই। আমাদের দেশ স্বাধীন করার মূল উদ্দেশ্যই ছিল অন্যায়-অবিচারের মূলোৎপাটন করা এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আর এটা একমাত্র যথাযথ আইনের শাসনের মাধ্যমেই সম্ভব।

আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে, কিভাবে আমরা দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও আইনের মর্যাদা উন্নত করতে পারি। জাতিগতভাবে যে অবক্ষয়ের গর্তে আমরা নিক্ষিপ্ত হয়েছি তা থেকে আমাদের উদ্ধার পেতে হবে। এ জন্য আমাদের জাতীয় চিন্তার ও জাতীয় চরিত্রের পুনরগঠন দরকার।

এক. আমাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় কমে গেছে। এটা প্রমাণ করে আমাদের আল্লাহ বিশ্বাসে ঘুণ ধরে গেছে। মুসলমান হিসেবে আল্লাহকে যেভাবে বিশ্বাস করা উচিত, সেভাবে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। অন্যথায় তা আল্লাহ বিশ্বাস হিসেবে পরিগণিত হবে না। কাজেই এর মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি যথার্থ ভীতি ও ভালোবাসা জন্মাবে না।

দুই. আল্লাহ বিশ্বাসের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে চারিত্রিক দৃঢ়তা সৃষ্টি করতে হবে। ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে যাবার ক্ষেত্রে আমাদের কোনো রকম আপসের পথ অবলম্বন করা যাবে না।

তিন. মুনাফিকী চরিত্র পরিহার করতে হবে। কথায় ও কাজে এক হতে হবে। পশ্চিমা উস্তাদদের কাছ থেকে শেখা প্রতারণামূলক ডিপ্লোম্যাসি বর্জন করতে হবে। নিজের জন্য এক এবং অন্যের জন্য আরেক মানদণ্ড- এ থেকে হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থান করতে হবে।

চার. দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে একনিষ্ঠ হতে হবে। অকল্যাণ নয়, কল্যাণকামিতাই হবে আমাদের জীবনের ব্রত।

এভাবে দেশ জাতি ও মানবতাকে বাঁচাবার লক্ষে আমাদের চারিত্রিক পুনরগঠন করতে হবে। আইনের প্রতি যথার্থ আনুগত্য করার লক্ষে আইন প্রণয়ন করতে হবে। আইনকে পাশ কাটিয়ে নিজেদের স্বার্থোদ্ধার করার উদ্দেশ্যে নয়। আইনই যথার্থ উন্নত সুখী সমৃদ্ধ ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠন করতে পারে। আইনকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করা যাবে না।

তবে বর্তমানে মানুষের তৈরি এই অস্বাভাবিক আইনের পরিবর্তে আমাদের আল্লাহর তৈরি স্বাভাবিক আইনের দিকে ফিরে যাবার কোনো বিকল্প নেই, অবিশ্বাসী ও অপরাধীরা যতই এটা অপছন্দ করুক না কেন।

আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ঃ ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৪, পৃষ্ঠা ৯-৪৪

ইসলামী বিধানে রিবা : আধুনিক প্রেক্ষাপটে সংশয় নিরসন

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ সোলায়মান*
মুহাম্মদ রুহুল আমিন**

[সারসংক্ষেপ : মহান আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও রিবাকে হারাম করেছেন। তিনি বলেন, "আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও রিবাকে করেছেন হারাম।" রিবার নিজস্ব পরিসর রয়েছে, যা বাংলা সুদ শব্দের চেয়ে অনেক বড়। ইসলামে রিবার নিষেধাজ্ঞা এসেছে। কিন্তু কিছু লোক অজ্ঞতাবশত বা ইসলামী বিধানের সাথে শত্রুতামূলক রিবার এ নিষেধাজ্ঞাকে বৈধ করার অপপ্রয়াস চালায়। আবার কেউ কেউ রিবাকে ব্যবসায়িক মুনাফার সাথে তুলনা করেন। ইসলাম অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবে রিবার নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেছে। যে নিষেধাজ্ঞা কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলীল এবং ইজমায়ে উম্মাতের মাধ্যমে সাব্যস্ত। তা ছাড়া বাস্তবতাও রিবা পরিত্যাগের দাবি রাখে। যারা বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে রিবাকে বৈধ বা ব্যবসায়িক মুনাফার সাদৃশ্য প্রমাণ করতে চায় এ প্রবন্ধে ইসলামে রিবার বিধান বর্ণনার সাথে সাথে তাদের সেসব যুক্তি উল্লেখপূর্বক বর্ণনামূলক দলীল ও বাস্তব প্রেক্ষাপটের আলোকে তার অসারতা প্রমাণ করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।]

মানবজীবনে অর্থের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। জীবনধারণের জন্য মানুষকে কিছু না কিছু অর্থের মালিক হতে হয়, সম্পদ অর্জন করতে হয়। কিন্তু এই সম্পদ অর্জনের পন্থা নিয়ে অর্থনৈতিক মতবাদগুলো পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। ইসলাম মানুষকে অর্থোপার্জনের অবাধ স্বাধীনতা দেয় না। সামাজিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বৈধতা-অবৈধতার পার্থক্য সৃষ্টি করে ইসলাম সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে সমাজ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর প্রবণতা ও কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে রিবার নিষেধাজ্ঞা অন্যতম।

রিবা মানবতার জন্য এক ভয়াবহ অভিশাপ, অর্থনৈতিক শোষণ, বৈষম্য ও জুলুমের অন্যতম হাতিয়ার। রিবা মানুষের মানসিকতাকে সংকীর্ণ করে দেয়, মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। রিবা অর্থনৈতিক গতিকে শ্লথ করে দেয়, অর্থবন্টনে বৈষম্য সৃষ্টি করে

---

* চেয়ারম্যান, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
** বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ, ক্যামব্রিয়ান কলেজ, ঢাকা।

এবং অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনীতিকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। সর্বোপরি রিবা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। এ জন্যই ইসলামে রিবা নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ রিবাকে হারাম ঘোষণা করেছেন, রিবা তথা সুদী লেনদেন পরিচালনাকে কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, আল-কুরআনে এ সম্পর্কে ভীতিপ্রদ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন এবং রিবার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিবাকে মানবতা বিধ্বংসী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন এবং রিবার গ্রহীতা, দাতা, লেখক, সাক্ষী সকলকে অভিশাপ দিয়েছেন।

ক্ষতিকারক প্রভাব সত্ত্বেও পাশ্চত্যের পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি হলো রিবা। রিবা বা সুদই হলো পাশ্চাত্য অর্থ ব্যবস্থার জীয়নকাঠি। রিবা ভিত্তিক কারবার বর্তমানে এত বেশি প্রচলিত হয়েছে যে, কেউ তা থেকে মুক্ত থাকতে পারছে না। ঠিক যেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর বাস্তবচিত্র : "মানুষের উপর এমন এক সন্ধিক্ষণ আসবে যখন তারা সকলেই সুদ খাবে। যে অল্প সংখ্যক লোক সুদ খাবে না তাদেরকেও সুদের মলিনতা স্পর্শ করবে।"[১]

কিছু কিছু প্রাচ্যবিদ (Orientalist) ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করে নিষিদ্ধ ঘোষিত রিবাকে বৈধ করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। তাদের যুক্তি মূলত অসার ও অযথা সংশয় ছাড়া অন্য কিছু নয়। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা রিবার নিষেধাজ্ঞাকে খণ্ডন করার ব্যাপারে তাদের উত্থাপিত বিভিন্ন যুক্তির অসারতা প্রমাণ এবং কুরআন-সুন্নাহর দলীলের ভিত্তিতে এ সংক্রান্ত সন্দেহ-সংশয়সমূহ নিরসনের প্রয়াস পাব।

রিবার আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে রিবা (ربا) শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়–

১. **বৃদ্ধি**: যেমন, যখন ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় তখন বলা হয় : ربا المال অর্থাৎ সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে।[২] এ অর্থে মহান আল্লাহর বাণী: "যে সুদ তোমরা দিয়েছ এই উদ্দেশ্যে যে, মানুষের ধন বৃদ্ধি পাবে, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না।"[৩]

২. **অতিরিক্ত**: যেমন আল্লাহর বাণী: "ফলে তিনি কঠোর হস্তে পাকড়াও করলেন।"[৪] ইমাম জাওহারী ও ফারা' আয়াতে বর্ণিত رابية এর অর্থ করেছেন زائدة বা অতিরিক্ত বস্তু। যেমন যখন কেউ প্রদেয়ের চেয়ে বেশী পায় তখন বলে: أربيت বা আমি অতিরিক্ত পেয়েছি।[৫]

৩. **বিকাশঃ** যেমন আল্লাহর বাণী: "তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও অত:পর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি তখন তা সতেজ ও বিকশিত হয়।"[৬] আয়াতে বর্ণিত ربت অর্থ ارتفعت و نمت বা উন্নত ও বিকশিত হওয়া।[৭]

৪. **সংখ্যাধিক্য ও ক্ষমতাঃ** যেমন কুরআনে এসেছে : "যাতে একদল অন্যদল অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান হয়।"[৮] মুফাস্‌সিরগণ أمة هي أربى এর ব্যাখ্যায় বলেন, أمة هي أكثر عددا من الأمة الأخرى অর্থাৎ- যে দল অন্য দলের তুলনায় সংখ্যায় বেশি।[৯]

৫. **ভূপৃষ্ঠ থেকে উঁচুস্থান :** এ অর্থ বুঝানোর জন্য রিবা শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[১০] এ অর্থে আল্লাহর বাণী: "অত:পর স্রোতধারা স্ফীত ফেনারাশি উপরে নিয়ে আসে।"[১১]

একইভাবে আল্লাহর বাণী: "আর আমি মরিয়ম তনয় ও তাঁর মাকে এক নিদর্শন বানিয়েছিলাম এবং তাদেরকে এক অবস্থানযোগ্য স্বচ্ছ পানি বিশিষ্ট টিলায় আশ্রয় দিয়েছিলাম।"[১২]

৬. **শিশুর বেড়ে ওঠা :** এ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন- যখন কারো তত্ত্বাবধানে কোন বর্ধিষ্ণু শিশু থাকে তখন বলা হয়: ربا الولد في حجر فلان 'অমুকের কোলে শিশুটি বেড়ে ওঠেছে।'[১৩]

৭. **মূল জিনিসের গাণিতিক বৃদ্ধি ও বরকতময় হওয়াঃ** আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং সাদকাকে বৃদ্ধি করেন।"[১৪] يربى الصدقات অংশের ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণ বলেন, "আল্লাহ সাদকাসমূহ দুনিয়ায় বরকতের মাধ্যমে বৃদ্ধি করেন এবং আখেরাতে তার সওয়াব কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেন।"[১৫]

৮. **ফুলে ওঠা বা স্ফীত হওয়া :** যেমন গম বা যবের ছাতুতে পানি ঢালার পর তা উতলিয়ে ওঠলে বলা হয় : ربا السويق বা ছাতু ফুলে ওঠেছে।[১৬] একইভাবে শত্রুপক্ষের অশ্ব আক্রমণের জন্য স্ফীত হলে বলা হয়, ربا الفرس ।[১৭]

অতএব বলা যায়, রিবা বলতে সাধারণ অর্থে মূলধনের উপর বাড়তিকে বুঝায়। কিন্তু ইসলামে সব ধরনের বাড়তিকে সুদ বা রিবা বলা হয়নি এবং এ ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিসর নির্ধারণ করা হয়েছে।

পারিভাষিক অর্থ

পরিভাষায় রিবার সংজ্ঞা নির্ণয়ে মতপার্থক্য বিদ্যমান। এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল-

১. ইমাম ওয়াহেদী বলেন, "ব্যবসা ছাড়া মূলধনের প্রবৃদ্ধির নাম রিবা।"[১৮]

২. আল্লামা আইনী বলেন, আমাদের পন্থী আলিমগণ রিবার সংজ্ঞায় বলেন, "পারস্পরিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বিনিময় ছাড়া মালের প্রবৃদ্ধিই রিবা।"[১৯]

৩. আল্লামা ইবনুল আরাবী বলেন, "বৈধ বিনিময় মাধ্যম ছাড়া সকল প্রকার প্রবৃদ্ধিই রিবা।"[২০]

৪. ইবনে কুদামা বলেন, "নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধির নাম রিবা।"[২১]

৫. ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, "পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে প্রদেয় অতিরিক্ত পণ্য বা অর্থই রিবা।"[২২]

চার মাযহাবের দৃষ্টিতে রিবা

চার মাযহাবের ফকীহগণ বিভিন্ন আঙ্গিকে রিবার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তবে তাঁদের মূলবক্তব্য একই।

১. হানাফীগণ বলেন, "রিবা বলা হয় সম্পদের ঐ প্রবৃদ্ধিকে যা সম্পদ বিনিময়ের ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতার জন্য শরীয়ত আরোপিত শর্ত বহির্ভূত অন্য কোন বিনিময় থেকে আসে।"[২৩]

২. মালেকীগণ বলেন, "রিবা বলা হয় প্রকৃত ওজন বা সংখ্যার উপর প্রবৃদ্ধি অথবা ঋণ পরিশোধে বিলম্বিত হওয়ার ধারণায় পূর্বে শর্তকৃত নির্দিষ্ট অর্থকে।"[২৪]

৩. শাফেয়ী আলিমগণের মতে, "ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করার ক্ষেত্রে অথবা সম্পদের বিনিময়ের বেলায় এমন চুক্তি সম্পদান করা যা ইসলামী শরীয়তে অপরিচিত।"[২৫]

৪. হাম্বালীগণ বলেন, "নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধিই রিবা।"[২৬]

উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহের বর্ণনাভঙ্গি পৃথক হলেও আলোচ্য বিষয় একই। আর তা হলো, প্রদত্ত ঋণের উপর পূর্ব নির্ধারিত প্রবৃদ্ধিই রিবা।

ইসলামী অর্থনীতিবিদগণের অভিমত

ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ রিবার সংজ্ঞা প্রদান করতে যেয়ে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। আলোচনার সুবিধার্থে এখানে আমরা দু একটি মতামত উল্লেখ করব।

১. ড. মাহমুদ ইবনে আল-খাতীব বলেন, "রিবা বলা হবে, কোন প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য বা শরয়ী মাধ্যম ছাড়া মূলধনের প্রবৃদ্ধিকে।"[২৭]

২. ওমর চাপরা বলেন, শরীয়তে রিবা বলতে ঐ প্রিমিয়ামকে বোঝায় যা ঋণের শর্ত হিসেবে অথবা মেয়াদ শেষে তা বৃদ্ধির শর্ত হিসেবে ঋণগ্রহীতা অবশ্যই মূল অর্থসহ ঋণদাতাকে পরিশোধ করতে বাধ্য।"[২৮]

৩. এম. এ. হামিদ রিবার চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন[২৯]–

* এটা অবশ্যই ঋণের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে, তা টাকায় হোক অথবা দ্রব্যসামগ্রী ও সেবায় হোক;
* পরিশোধের সময় পূর্ব নির্ধারিত হারে একটা অর্থ দিতে হবে:
* পরিশোধের জন্য পূর্বেই একটা সময়সীমা নির্ধারিত হবে এবং
* পরিশোধের জন্য এসব প্রসঙ্গ ঋণের শর্ত হিসেবে গণ্য হবে।

রিবা ও সুদ

আরবী ভাষায় বিশেষত: কুরআন মাজীদে রিবা দ্বারা যে বিষয়টি ব্যক্ত করা হয়েছে বাংলা ভাষায় তার প্রতিশব্দ না থাকায় সাধারণত: সুদ শব্দ দ্বারা এর অনুবাদ করা হয়েছে। এতে স্বাভাবিকভাবে মনে হয়, রিবা ও সুদ সমার্থবোধক শব্দ। কিন্তু প্রকৃত বিষয়টি এরকম নয়। বরং রিবা শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। আর প্রচলিত সুদ সেই ব্যাপক অর্থেরই একটি অংশ মাত্র। প্রচলিত অর্থে সুদ বলা হয়, নির্দিষ্ট অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ প্রদান অথবা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয় করার বিপরীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা। নিঃসন্দেহে এ অর্থটিও রিবার সংজ্ঞার আওতাভুক্ত। কিন্তু রিবা এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর অর্থের পরিধি আরও ব্যাপক। তাই এমন অনেক ক্রয়-বিক্রয়ও রিবার অন্তর্ভুক্ত হয়, যেগুলোর মধ্যে বাকিতে লেনদেন চলে না।[৩০]

রিবার শ্রেণী বিভাগ

ইসলামী ফিকহর গ্রন্থসমূহে রিবা শব্দটি পাঁচ ধরনের লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।[৩১]

১. সুদভিত্তিক ঋণদানের ক্ষেত্রে। সূরা আল-বাকারার ২৭৫ নং আয়াত এর প্রমাণ।
২. রিবা আল-ফদল (বর্ধিষ্ণু রিবা)। এর আলোচনা একটু পরেই আসবে।
৩. কোন কোন সময় ক্রয়-বিক্রয়ের অবৈধ পদ্ধতির ক্ষেত্রেও রিবা শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কতিপয় মুফাস্সির সূরা আন্-নিসার ১৬১ নং আয়াতে ব্যবহৃত রিবা দ্বারা এ উদ্দেশ্য নিয়েছেন।[৩২]
৪. প্রতিউপহার পাওয়ার আশায় কাউকে উপহার দানের ক্ষেত্রে রিবা শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ মুফাস্সির সূরা আর্‌রুমের ৩৯ নং আয়াতে ব্যবহৃত রিবা শব্দ দ্বারা এ উদ্দেশ্য নিয়েছেন।[৩৩]
৫. যে কোন অবৈধ ও হারাম কাজের ক্ষেত্রেও রিবা শব্দটি ব্যবহৃত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সবচেয়ে নিকৃষ্ট সুদ হচ্ছে এক ভাই কর্তৃক আরেক ভাইয়ের মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা।"[৩৪]

রিবাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে–

১. রিবা আল-নাসিয়াহ (ربا النسيئة) বা মেয়াদী সুদ

এটি মূলত: ঋণের বিপরীতে প্রদেয় রিবা। এ শ্রেণীর রিবাকে জাহেলী যুগের রিবা (ربا الجاهلية), প্রত্যক্ষ রিবা (ربا المباشر), কুরআনে বর্ণিত রিবা (ربا القرآن), ঋণের রিবা (ربا القروض), ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়।[৩৫] আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম একে (الربا الجلي) তথা প্রকাশ্য রিবা বলেছেন।[৩৬] ব্যবহারগত দিক থেকে এর বিভিন্ন রূপ রয়েছে। যেমন–

ক. একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রিমিয়াম প্রদানের শর্তে অর্থ ধার দেয়। যদি ঋণগ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমুদয় অর্থ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়, হবে নতুন করে আবার সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হবে এবং এর পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়া হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে অনাদায়ী সুদ মূলধনে পরিণত হয়ে তা চক্রবৃদ্ধি আকারে চলতে থাকে। আল্লামা জাসসাস বলেন, "জাহেলী যুগে আরবরা রিবার লেনদেন বলতে যা জানত এবং করত তা ছিল এমন যে, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট বৃদ্ধির শর্তে দীনার ও দিরহাম কর্জ দেয়া।"[৩৭]

খ. ঋণের উপর বর্ধিত অর্থ মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করার শর্তে ঋণ নেয়া। অবশ্য মূলধন ঋণগ্রহীতার কাছে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থেকে যাবে অথবা মাসিক হারে প্রবৃদ্ধি সহকারে ঋণের সময়সীমা শেষে সমুদয় অর্থ গ্রহণ করা হবে।[৩৮]

গ. একই শ্রেণীর পণ্যসামগ্রী বিলম্বে প্রদানের কারণে পরিমাণে অতিরিক্ত গ্রহণ করা। যেমন: 'ক' 'খ' থেকে শীতকালে এই শর্তে একমণ খেজুর ক্রয় করল যে, সে গ্রীষ্মকালে দেড়মণ খেজুর প্রদান করবে।[৩৯]

২. রিবা আল-ফাদল (ربا الفضل) বা বর্ধিষ্ণু সুদ

এ শ্রেণীর রিবাকে ব্যবসায়ের রিবা (ربا البيوع), সুন্নাহ বর্ণিত রিবা (ربا السنة) ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়।[৪০] আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম এ শ্রেণীর রিবাকে অপ্রকাশ্য রিবা (ربا الخفي) বলেছেন।[৪১] ব্যবহারগত দিক থেকে এ রিবা ব্যবসায়িক লেনদেনের উপর নির্ভরশীল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী অনুযায়ী সোনা, রুপা, গম, যব, খেজুর ও লবণ এই ছয়টি সামগ্রী বিনিময়ের ক্ষেত্রে দ্রব্যগুলো ওজনে সমান সমান হতে হবে। তিনি বলেন, "স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ সমান সমান, একই মানের ও হাতে হাতে লেনদেন হবে। এছাড়া অন্য শ্রেণীর দ্রব্য সামগ্রী হাতে হাতে বিনিময়ের বেলায় তোমরা যেভাবে ইচ্ছা ক্রয়-বিক্রয় কর।"[৪২]

অতএব এ ছয় শ্রেণীর জিনিস বিনিময়ের ক্ষেত্রে দ্রব্যের গুণগত মান ও শ্রেণী একই হতে হবে। এর বিপরীতে কিছু হলে তা রিবা আল-ফদল বলে বিবেচ্য হবে। যেমন: ক খ থেকে উৎকৃষ্ট মানের একমণ গম নিয়ে নিকৃষ্ট মানের দেড়মণ প্রদান করলে তা রিবা আল-ফদল।

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় রিবা

ইসলামসহ বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় রিবার শোষণনীতির কারণে একে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা রিবা এক প্রকৃতি বিরুদ্ধ অর্জন। মানবতা ও মনুষত্যের দাবি এটাই যে, মানুষ দুঃসময়ে পরস্পরের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়াবে, কোন প্রকার অতিরিক্ত প্রাপ্তি ছাড়াই ঋণ প্রদান করবে। কিন্তু রিবায় তা পাওয়া যায় না। নিম্নে বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় রিবার বিধান আলোচনা করা হলো–

মূসা আলাইহিস্ সালামের শরীয়ত তথা ইয়াহুদী ধর্মে রিবা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "বস্তুত ইয়াহুদীদের জন্য আমি হারাম করে দিয়েছি অনেক পূত-পবিত্র বস্তু যা তাদের জন্য হালাল ছিল, তাদের পাপের কারণে এবং আল্লাহর পথে অধিক পরিমাণ বাধাদানের কারণে। আর এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করত, অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে তারা অপরের সম্পদ ভক্ষণ করত অন্যায় পন্থায়, বস্তুত আমি কাফিরদের জন্য তৈরি করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব।"[৪৩]

ইয়াহুদীদের উপর রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ শুধু কুরআনের বর্ণনা থেকেই প্রমাণিত নয় বরং মূল তাওরাতের পরিবর্তন-পরিবর্ধন সত্ত্বেও তাতে রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান বর্তমান রয়েছে। তাওরাতের বিভিন্ন স্থানে এ নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায়। যেমন–

সিফরুল খুরুজের ২২তম অধ্যায়ের ২৪তম স্তবক; সিফরুল আহবারের ২৫তম অধ্যায়ের ৩৫তম স্তবক; সিফরে তাছনীয়ার ২৩তম অধ্যায়ের ১৯তম স্তবক; সিফরুল আমছালের ২৮তম অধ্যায়ের ৮ম স্তবক।[৪৪]

মহান আল্লাহ শোয়াইব আলাইহিস্ সালামের ইবাদাত, সালাত কায়েম ও রিবা পরিত্যাগের দাওয়াতকে উল্লেখ করে বলেন, "তারা বলল, হে শোয়াইব! আপনার নামায কি আপনাকে এই শিক্ষাই দেয় যে, আমরা ঐসব উপাস্যদের পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত? অথবা ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা করে থাকি তা পরিত্যাগ করব?"[৪৫]

ইয়াহুদীদের মত নাসারাদেরও রিবা পরিত্যাগের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। ইঞ্জিল লুকে বর্ণিত হয়েছে, মাসীহ্ বলেন, "যখন মুখাপেক্ষীদেরকে তোমরা ঋণ দেবে তখন

এর বিনিময়ে কোন প্রবৃদ্ধি খোঁজ করবে কেন? বরং তোমরা কল্যাণকর কাজ কর, তবেই তোমরা দৃষ্টান্তবহ পুণ্যের অধিকারী হবে।"[৪৬]

গীর্জার পাদ্রী, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও সমস্ত খৃষ্টান সংঘ এ ব্যাপারে একমত যে, ঈসা মসীহ সূত্রে প্রাপ্ত শিক্ষা প্রমাণ করে রিবা ভিত্তিক লেনদেন সম্পূর্ণভাবে অবৈধ।[৪৭]

গ্রিক সভ্যতায় সুদের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনকে প্রকৃতিবিরোধী অর্জন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ সভ্যতার দার্শনিকগণ সুদী কারাবার থেকে জনগণকে নিষেধ করেছেন। প্লেটো ও এ্যারিস্টোটল দেখিয়েছেন, রিবা সম্পদ অর্জনের এক নিকৃষ্টতম অবলম্বন। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি বিপর্যয়ের মুখোমুখী হয় এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়।[৪৮]

গ্রিক সভ্যতার মত রোমান সভ্যতায়ও রিবাকে প্রকৃতি বিরোধী উপার্জন ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। আমেরিকান বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, রোমান সভ্যতায় সুদকে অপ্রাকৃতিক উপার্জন, শোষণ ও সামাজিক বৈষম্যের হাতিয়ার বলা হয়েছে। তবে তাদের লিখিত পুস্তকাদির অনেক আগে গ্রিকদের এ সংক্রান্ত অনেক মন্তব্য পাওয়া যায়।[৪৯]

জাহেলী যুগে আরব কুরাইশরাও রিবাকে সম্পদ অর্জনের অনিষ্টকর পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করতো। দেখা যায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর আগে যখন কাবা সংস্কার করা হচ্ছিল তখন আবু ওয়াহাব সকলকে এ কাজে রিবার অর্থ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিল। বর্ণিত আছে, কুরাইশরা জরাজীর্ণ কা'বা ভেঙ্গে নতুনভাবে তৈরির ব্যাপারে একমত হয়। কাজের শুরুতে আবু ওয়াহাব একটি পাথর গ্রহণ করে কিন্তু তাৎক্ষণিক তার হাত থেকে পাথরটি পড়ে আগের স্থানে চলে যায়। তখন তিনি বলেন, হে কুরাইশরা! তোমরা এ কাবা তৈরিতে অপবিত্র কোন উপার্জন অন্তর্ভুক্ত কর না। তোমাদের কেউ যেন এর মধ্যে পতিতার উপার্জন, সুদের অর্থ, অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা কোন অর্থ সম্পদ প্রবেশ না করায়।[৫০]

আবু ওয়াহাবের কথা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, রিবা জাহেলী যুগেও অবৈধ উপার্জন হিসেবে স্বীকৃত ছিল।

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় রিবার অবস্থান ব্যাখ্যা করতে যেয়ে মিলস্‌ ও প্রিসলে উত্তম চিত্রাংকন করেছেন। "ইতিহাসের কাল পরিক্রমায় দেখা যায়, অন্যের দুর্ভাগ্য হতে মুনাফা অর্জনের জন্য সুদখোরদের নিন্দা করা হয়েছে। প্লুটার্ক বিশ্বাস করতেন, বিদেশী আক্রমণকারীদের চেয়ে সুদের বিনিময়ে টাকা ঋণদানকারীরা অধিকতর নির্যাতনকারী (Moralia, ৮২৯)। অপরদিকে মধ্যযুগের গির্জা সুদখোরদেরকে অপরিসীম লোভ ও কৃপণতার কারণে দেহপসারিনীদের সমতুল্য বিবেচনা করেছে

(Le Goff, ১৯০৯, পৃ- ৩৫-৩৬)। দান্তে সুদখোরদের নরকের অগ্নিবৃষ্টিময় সপ্তম বৃত্তে ঠাঁই দিয়েছেন (Divina Comedia, ১৭শ স্বর্গ)। অপরদিকে শাইলক (সেক্সপিয়ারের The Merchant of Venice) হতে হারপাগণ (মালিয়েরের The Miser) পর্যন্ত সুদখোররা তাদের প্রবাদতুল্য কৃপণতার জন্যে সাহিত্যে বিদ্রূপের খোরাক হয়ে আছে। সুদখোরদের কদাচিৎ সামাজিক মর্যাদা দেয়া হয়েছে।"[৫১]

ইসলামে রিবার বিধান

ইসলামে সকল প্রকার রিবা নিষিদ্ধ। এ নিষেধাজ্ঞা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত।

১. কুরআন থেকে প্রমাণ

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে রিবার নিষেধাজ্ঞা, রিবা গ্রহণের ইহলৌকিক কুফল ও পরকালীন শাস্তি ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। সকল প্রকার রিবাকে স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।"[৫২]

সুদ পরিত্যাগ করার নির্দেশ এসেছে এভাবে, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সব বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।"[৫৩]

অত্র আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে,"তোমরা যেসব সম্পদ রিবার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করেছ এবং তোমাদের মূলধনের যে প্রবৃদ্ধি এখনো গ্রহণ করতে বাকি আছে তোমরা তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাক। যদি কিনা তোমরা তোমাদের কথায় ও কাজে ঈমানের বাস্তব প্রতিফলনকারী হয়ে থাক।"[৫৪]

ইমাম আবু হানীফা র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, "এ আয়াতটি পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে ভীতিপ্রদ আয়াত। কেননা মুমিনগণ তাকওয়া অবলম্বন না করলে মহান আল্লাহ এ আয়াতে তাদেরকে জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন, যে জাহান্নাম কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।"[৫৫]

যারা রিবা পরিত্যাগ করে না কুরআন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা রয়েছে– "অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।"[৫৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পার।"[৫৭]

২. সুন্নাহ থেকে প্রমাণ

রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। জাবির রা. বলেন, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদের খাদক, দাতা, লেখক ও সাক্ষী সকলকে লানত করেছেন। তিনি বলেন, তারা সকলেই সমান"।[৫৮]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "তোমরা সাতটি ধ্বংসযজ্ঞ কাজ থেকে বিরত থাক। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সেগুলো কী কী? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা, যাদুটোনা, অন্যায়ভাবে আল্লাহর হারামকৃত নফসকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা, সতী-সাধ্বী মুমিন নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া।"[৫৯]

রিবার ভয়াবহতা উল্লেখ করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি এক দিরহাম পরিমান সুদ খায় তা আল্লাহর কাছে ছত্রিশবার যিনার চেয়েও ভয়াবহ।"[৬০]

৩. ইজমায়ে উম্মত

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর উপরিউক্ত স্পষ্ট বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়, ইসলামে রিবা নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে পূর্বাপর সকল আলিম একমত। আল্লামা ইব্‌নে হাযম, ইব্‌নে কুদামা প্রমুখ মুসলিম উম্মাহর সেই ইজমা বর্ণনা করে বলেন, "সকল আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, ঋণের উপর শর্তযুক্ত সকল প্রবৃদ্ধিই হারাম।"[৬১]

রিবা কর্মকাণ্ডে জড়িতদের শাস্তি বিধান

ইসলামে সুদ ও সুদী কারবার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। যদি কেউ এ গর্হিত কাজ করে তবে তার অপরাধের মাত্রানুযায়ী মুসলিম শাসক রিবার অর্থ ফেরত নেয়া, আর্থিক জরিমানা, আটকাদেশ, বেত্রাঘাত, নির্বাসন, মৃত্যুদণ্ড এমন কি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাও করতে পারেন।

আল্লামা জাস্‌সাস বলেন, "রিবার মাধ্যমে যেহেতু মানুষের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে কুক্ষিগত করা হয়, সেহেতু তার শাস্তি ছিনতাইকারীর শাস্তির[৬২] মত হবে।"[৬৩]

আল্লামা ইবনে কাছীর বলেন, "যে ব্যক্তি সুদী লেনদেন থেকে বিরত থাকতে পারে না; মুসলিম শাসক তাকে প্রথমে তওবাহ পড়াবেন, এতে যদি সে নিবৃত্ত না হয় তবে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। কেননা যে বৈধ মনে করে সুদী কারবারে জড়িত হবে সে মুরতাদ হয়ে যাবে।[৬৪]

ইসলামে রিবা হারাম হওয়ার পরিক্রমা

মহান আল্লাহ রিবা নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে এক উত্তম কৌশল গ্রহণ করেন; যেভাবে তিনি অন্যান্য সকল শরয়ী বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে করেছেন। সাধারণত কোন বিধান প্রবর্তন তথা প্রচলিত কোন প্রথা নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ যে ক্রমধারা অবলম্বন করেন তা হল, ইশারা-ইঙ্গিত, অতঃপর বিস্তারিত বর্ণনা, এরপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা, সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ বিধান। রিবার পূর্ণাঙ্গ নিষেধাজ্ঞা চারটি পর্যায়ে আসে।[৬৫]

প্রথম পর্যায়

আল্লাহ বলেন, "যে সুদ তোমরা দিয়েছ এই উদ্দেশ্যে যে, মানুষের ধন বৃদ্ধি পাবে, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না।"[৬৬]

আলোচ্য আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়। আয়াতটিতে রিবার নিষেধাজ্ঞা আসেনি বরং রিবার প্রতি আল্লাহর অসন্তোষের ঘোষণা এসেছে। নেতিবাচক উপদেশের মাধ্যমে মুমিনগণের অন্তরে রিবার প্রতি ঘৃণা জন্মানই আয়াতের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় পর্যায়

মহান আল্লাহর বাণী, "বস্তুত ইয়াহুদীদের জন্য আমি হারাম করে দিয়েছি অনেক পূত-পবিত্র বস্তু যা তাদের জন্য হালাল ছিল– তাদের পাপের কারণে এবং আল্লাহর পথে অধিক পরিমাণ বাধাদানের কারণে। আর এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করত, অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে তারা অপরের সম্পদ ভক্ষণ করত অন্যায় পন্থায়, বস্তুত আমি কাফিরদের জন্য তৈরি করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব।"[৬৭]

অত্র মাদানী আয়াত দুটিতে মহান আল্লাহ ইয়াহুদীদের চরিত্র বর্ণনা করতে যেয়ে তাদের উপর রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন। পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ শরীয়ত মূসা আলাইহিস্ সালামের শরীয়তে সুদ নিষিদ্ধ থাকার ইতিহাস বর্ণনা করে আল্লাহ মু'মিগণকে ইসলামী শরীয়তে রিবার নিষেধাজ্ঞা গ্রহণের জন্য মানসিকভাবে তৈরী করেছেন। অর্থাৎ এ পর্যায়ে ইশারা-ইঙ্গিতে সুদ নিষিদ্ধ হয়েছে স্পষ্টভাবে নয়।

তৃতীয় পর্যায়

আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পার।"[৬৮]

অত্র আয়াতটিও মদীনায় অবতীর্ণ হয়। অত্র আয়াতে স্পষ্টভাবে রিবার নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তবে তা আংশিক নিষেধাজ্ঞা এ নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র কদর্য রিবা (ربا الفاحش) যা চক্রবৃদ্ধি হারে রূপ নিত সে শ্রেণীকেই হারাম করা হয়েছে।

চতুর্থ ও সর্বশেষ পর্যায়

রিবার হুকুম নিয়ে সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হল, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যেসব বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।"[৬৯]

অত্র আয়াতটি রিবার বিধান সম্পর্কিত সর্বশেষ আয়াত। এমন কি বুখারী শরীফে উমর ও ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, এ আয়াতটি পবিত্র কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত।[৭০]

অত্র আয়াতে স্পষ্টভাবে সকল প্রকার রিবাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

রিবা সংক্রান্ত সংশয় ও তা নিরসন

ইসলাম যা কিছু হারাম ঘোষণা করেছে তা স্থান, কাল পাত্রভেদে সর্বক্ষেত্রেই হারাম। কোন জিনিসে মানবতার কল্যাণ-অকল্যাণ তা মহান আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। মানবতার কল্যাণের জন্য তিনি যা কিছু হারাম করেছেন তা চিরকালের জন্যই হারাম। রিবা তেমনই এক হারাম। কিন্তু রিবার এ নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে কোন কোন ব্যক্তি কিছু অমূলক সংশয় প্রকাশ করেন। কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে যা অগ্রাহ্য। নিম্নে তাদের প্রকাশিত সংশয় উল্লেখ পূর্বক তা অপনোদনের প্রয়াস নেয়া হল–

সংশয়-১ : কুরআন মাজীদে মহাজনী সুদকে হারাম করা হয়েছে, বাণিজ্যিক সুদ হারাম করা হয়নি

রিবা সম্পর্কে সবচেয়ে বড় ও প্রধান যে সংশয় উত্থাপন করা হয় তাহল, কুরআন মাজীদে যে রিবা হারাম করা হয়েছে তা হল মহাজনী সুদ (Usury), বাণিজ্যিক ঋণ বা সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রদেয় বাণিজ্যিক সুদকে (Commercial Interest) নয়। এর পিছনে তারা যুক্তি দেখিয়ে বলেন, যে অবস্থার প্রেক্ষিতে কুরআনে রিবার নিষেধাজ্ঞা এসেছে সে সময়ে যে সুদের প্রচলন ছিল তা মূলতঃ এমন যে, জাহেলী যুগের ঋণগ্রহীতারা ছিল গরিব ও অসহায়। জীবন-যাপনের ব্যবস্থাপনা ছিল তাদের নাগালের বাইরে। অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার অর্থকড়িও মিলত না; এমনকি তাদের কেউ যদি মারা যেত তবে তাদের দাফন-কাফনেরও ব্যবস্থা হত না। এমন এক কঠিন পরিস্থিতিতে কেউ কারোও কাছে ঋণ নিতে গেলে বিনা সুদে ঋণ প্রদান করত

না। ফলে মহান আল্লাহ এই মহাজনী সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বর্তমানে ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যে সুদের লেনদেন করা হয় তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত ব্যক্তিরা সাধারণত: ঋণ নেয় না। বরং পুঁজিপতিরা তাদের কারবার সম্প্রসারণ ইত্যাদি কারণে ঋণ নিয়ে থাকে। এক কথায় বর্তমান সময়ে প্রচলিত বাণিজ্যিক ঋণের (Commercial loan) কোন অস্তিত্ব সে সময়ে ছিল না। বরং এটি ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের পরের সৃষ্টি। অতএব যেসব আয়াতে সুদকে হারাম করা হয়েছে বাণিজ্যিক সুদ হারাম হওয়ার জন্য তা দলীল হতে পারে না।[৭১]

সংশয় নিরসন-১

এ সংশয়ের নিরসন করতে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো তুলে ধরতে পারি–

ক. পরিভাষা দু'টির পটভূমি

যখন মুসলিম বিশ্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চিমা বিশ্বের গোলামে পরিণত হয়, তখন ঊনবিংশ শতাব্দির কোন কোন মুসলিম শাসক শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় অগ্রগতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলমানদের অর্থনৈতিক অনুন্নতির প্রতি দৃষ্টি দেন। তারা উপলব্ধি করেন যে, শিল্প ও বাণিজ্যের জগতে ব্যাংক এমন এক প্রতিষ্ঠান যার গুরুত্ব কেবল জাতীয় পর্যায়ে নয় বরং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত। এ অনুভূতি থেকে তারা এক পর্যায়ে বলতে শুরু করেন, শুধু মহাজনী সুদই হারাম, বাণিজ্যিক সুদ নয়। কারণ বাণিজ্যিক সুদ হারাম হলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানা ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। এ জন্য তারা কুরআনে নিষিদ্ধ ঘোষিত রিবা শব্দের ইংরেজি অর্থ (Usury) দ্বারা মহাজনী সুদ উদ্দেশ্য করে বাণিজ্যিক সুদের জন্য Interest শব্দটি প্রয়োগ করা শুরু করে দেন। প্রচার করা হয়, ইসলাম যে রিবা নিষিদ্ধ করেছে তা মহাজনী সুদ, বাণিজ্যিক সুদের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। ভারত উপমহাদেশে এই চিন্তাধারা প্রচার প্রসারে মুখ্য ভূমিকা রাখেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও তাঁর মতালম্বী কিছু লোক।[৭২]

খ. আকৃতির পরিবর্তনে মূল বিধান বদলায় না

ইসলামী আইনের মূলনীতি অনুযায়ী এটা জরুরী নয় যে, কোন বস্তু হারাম হওয়ার জন্য হুবহু অকৃতিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় তার অস্তিত্ব থাকতে হবে। বরং কুরআন মাজীদ কোন বস্তু হারাম করলে তার মূল প্রকৃতিকে হারাম করে। তাই তার বিশেষ আকৃতি আল্লাহর রসূলের যুগে পাওয়া যাক বা না যাক। যেমন মদ হারাম, মদের প্রকৃতি হল এমন পানীয় যা মাদকতা সৃষ্টি করে।

এখন যদি কেউ বলে বর্তমান যুগে প্রচলিত হুইস্কি, বিয়ার, ব্রান্ডি, প্যাথড়িন, হিরোইন এসবের কোন অস্তিত্ব রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায় ছিল না অতএব এগুলো হারাম নয়। সে ব্যক্তির কথা যেমন হাস্যরসে পরিণত হবে ঠিক তেমনি সুদের ব্যাপারটিও। মূলধনের উপর ইসলামী নীতিমালায় অজ্ঞাত যে কোন ধরনের বাড়তি অর্থ গ্রহণই সুদ। তাই সেটি যে নামেই আসুক।

গ. নবী যুগের ব্যবসা-বাণিজ্য

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ সম্পর্কে অজ্ঞতাবশতঃ তারা বলতে চায়, সে যুগে বাণিজ্যিক সুদ বলতে কোন পরিভাষার অস্তিত্ব ছিল না। অথচ তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা কুরআনের সূরা কুরাইশ আমাদেরকে সেযুগের ইতিহাস বর্ণনা করে বলছে, কুরাইশরা বছরে দু'টি বাণিজ্য বহর পরিচালনা করত, একটি গ্রীষ্মকালে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে এবং অপরটি শীতকালে ইয়ামেনের উদ্দেশ্যে। এ বাণিজ্য বহর পরিচালনার জন্য তারা ব্যাপকভাবে ঋণ গ্রহণ করতো। বর্ণিত আছে, কোন কোন সময় এই ঋণের পরিমান দশ লাখ দিনার পর্যন্ত পৌঁছাত।[৭৩] আবূ সুফিয়ানের যে বাণিজ্যিক কাফেলার উপর আক্রমণ করার জন্য মুসলমানগণ মনস্থ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত যা বদর যুদ্ধের কারণে পরিণত হয়েছিল এমন কোন মক্কাবাসী ছিল না যার কিছু না কিছু সম্পদ ঐ কাফেলায় ছিল না।[৭৪] তবে কি মক্কার সকলেই পুঁজিপতি ছিলেন? না, বরং তারা ঋণ নিয়ে হলেও ঐ কাফেলার বাণিজ্যে শরীক হয়েছিলেন। তাহলে ঐ ঋণ কি বাণিজ্যিক ঋণ ছিল না? বাণিজ্যিক সুদ বলতে যা বুঝায় তার সব দাবিই তাদের সে সুদ ভিত্তিক লেনদেনে ছিল বিধায় সুদের নিষেধাজ্ঞা আসার সাথে সাথে তারা আপত্তি জানিয়ে বলে, সুদী লেনদেন তো এক প্রকার বাণিজ্য মাত্র।

ঘ. বনী আমর গোত্রের বাণিজ্যিক সুদী কারবার

বর্ণিত আছে, জাহেলী যুগে বনী আমর গোত্রের লোকেরা বনী মুগীরা গোত্রের লোকদের নিকট থেকে ঋণের বিনিময়ে সুদ গ্রহণ করত এবং বনী মুগীরা গোত্রের লোকেরা তাদেরকে সুদ প্রদান করতো। এমনকি যখন ইসলাম আসল তখন তাদের নিকট বড় অংকের পাওনা থেকে গিয়েছিল।[৭৫] এখানে তৎকালীন আরবের দু'টি গোত্রের পারস্পরিক সুদী কারবারের আলোচনা বর্ণিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এ দু'টি গোত্রের লেনদেনের ধরন বর্তমান যুগের বিভিন্ন বাণিজ্যিক কোম্পানির মতো। এছাড়াও অন্যান্য গোত্রের লোকেরা তাদের ধনসম্পদ একত্র করে এর দ্বারা যৌথ বাণিজ্যিক কারবার চালাতো। যাকে বর্তমান সময়ের অতি পরিচিত জয়েন্ট স্টক কোম্পানি নামে অভিহিত করা যায়। এসব গোত্রের পারস্পরিক সুদী লেনদেনকে বাণিজ্যিক সুদ ছাড়া অন্য কোন নামে নামকরণ করা যায় কি?

ঙ. আব্বাস ও খালিদ রা. এর যৌথ কারবার

সুদ হারাম হওয়ার পূর্বে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ও খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. মিলে যৌথ পুঁজি দ্বারা একটি অংশিদারী কারবার পরিচালনা করতেন। এর বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, সুদী ব্যবসা। তাঁদের এ ব্যবসা মক্কায় সীমিত ছিল না। তায়েফবাসীদের সাথেও এ ব্যবসা চলতো। বিশেষতঃ বনী আউফের শাখা গোত্র বনী আমরের সাথে তাঁদের লেনদেন ছিল খুব জোরদার।[৭৬]

আব্বাস রা.-এর সুদী ব্যবসা জীবন ও জীবিকার তাগিদে ছিল না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে সমস্ত সুদ নিষিদ্ধ করে ঘোষণা করেন, "আজ জাহিলী যুগের সব সুদ বর্জন করা হচ্ছে এবং সর্বপ্রথম আমি যে সুদ ছেড়ে দিচ্ছি তা হল, আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদ। সেসুদের সবটুকুই বর্জন করা হল।"[৭৭] বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, এ সুদের পরিমাণ ছিল দশ হাজার মিসকাল স্বর্ণ। প্রায় চার মাশায় এক মিসকাল হয়। আর এটি তার মূলধন ছিল না বরং সুদ ছিলো।[৭৮]

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা.-এর ব্যাংকিং সিস্টেম

জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের একজন ছিলেন যুবাইর রা.। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফাতো ভাই এবং আমানত ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অনেক বিত্তবান লোক তাঁর নিকট অর্থ সম্পদ আমানত রাখত এবং প্রয়োজনের সময় ফেরত নিতো। এ ক্ষেত্রে তিনি যে কর্মপন্থা গ্রহণ করতেন তা বর্তমান সময়ের ব্যাংকের মতই। তাঁর কাছে কেউ আমানত রাখতে আসলে তিনি বলতেন, "আমানত নয় বরং ঋণ"। এরপর তিনি ঐ আমানত ব্যবসায় লাগাতেন। তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর বলেন, আমি আমার পিতার পরিশোধযোগ্য ঋণ পেলাম তা ছিল বাইশ লাখ দিনার।[৭৯] সংশয় উপস্থাপনকারীদের কাছে আমাদের প্রশ্ন তাঁর এ বিরাট অংকের ঋণকে আপনারা কী হিসেবে ব্যাখ্যা করবেন?

প্রচলিত ব্যাংকিং ইন্টারেস্ট সর্বসম্মতক্রমে হারাম

বিশ্বের আলিমগণের সাথে সাথে মুসলিম অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকাররাও এ ব্যাপারে একমত যে, সাধারণ লেনদেনের সুদের মত ব্যাংকিং সুদও হারাম। এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোন আলিমের মতানৈক্য নেই। মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর স্মারকে এ বিষয়ে সারা বিশ্বের প্রায় দুই শত আলিম ঐকমত্য হয়ে স্বাক্ষর করেন।[৮০]

সুতরাং মহাজনী সুদ তথা ব্যক্তিগত ঋণের উপর সুদ নেয়া জায়েয নেই এবং বাণিজ্যিক ঋণের উপর সুদ নেয়া জায়েয এ জাতীয় দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

সংশয়-২ : ইসলামে নিষিদ্ধ রিবা হল চক্রবৃদ্ধি সুদ (Compund Interest)

রিবার ব্যাপারে অন্যতম প্রধান যে সংশয় উত্থাপন করা হয় তা হল, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে যে রিবা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা হল, চক্রবৃদ্ধি সুদ বা الربا المضاعف। এ প্রকার রিবা ছাড়া অন্য যেসব রিবায় প্রবৃদ্ধি হার স্বল্প তা ইসলামে বৈধ। তারা মনে করেন, সুদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত সূরা আলে-ইমরানের ১৩০ নং আয়াত এ সম্পর্কিত সূরা বাকারার ২৭৮ নং আয়াতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটি সূরা বাকারার আয়াতে বর্ণিত হুকুমকে রহিত করেছে।

তারা আরও বলেন, যদি সূরা বাকারার আয়াতটি শেষে অবতীর্ণ হয়েও থাকে তবে তাতে রিবার সাধারণ নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে, যা সূরা আলে ইমরানের আয়াতটির সাথে সাংঘর্ষিক যে আয়াতে রিবার নিষেধাজ্ঞাকে সীমিত করা হয়েছে। আর উসূলে ফিক্‌হর স্বীকৃত নীতি এটাই, যখন একই ব্যাপারে দুটি নস (কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট প্রমাণ) পাওয়া যাবে যার একটিতে সাধারণ নীতিমালা এবং অন্যটিতে সীমিত বিধান বর্ণিত হবে; তখন সীমিত বিধান সম্পর্কিত নসটি বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে অধিকতর গ্রহণীয় বিবেচ্য হবে। কেননা তখন বুঝা যাবে এক নসে বর্ণিত সাধারণ নীতিমালা দ্বারা অপর নসে বর্ণিত সীমিত বিধানই উদ্দেশ্য। যেমন সূরা মায়েদায় রক্ত হারাম হওয়া সম্পর্কিত আল্লাহর বাণী: "তোমাদের উপর মৃতজন্তু ও রক্ত হারাম করা হয়েছে।"[৮১]

আয়াতটি সামগ্রিকভাবে সকল প্রকার রক্তকে অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু এ বিধানের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আসে সূরা আল-আনয়ামের আয়াত : "অথবা প্রবাহিত রক্ত"।[৮২] উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রমাণিত হয় সূরা আল-মায়িদায় উল্লেখিত রক্ত দ্বারা প্রবাহিত রক্তই উদ্দেশ্য।

একইভাবে সূরা আল-বাকারায় বর্ণিত হারাম রিবা দ্বারা সূরা আলে ইমরানের চক্রবৃদ্ধি সুদই উদ্দেশ্য। সুতরাং চক্রবৃদ্ধি সুদ (الربا المضاعف)" তথা কদর্য রিবা (الربا الفاحش) কেবল হারাম। স্বল্প মাত্রার রিবা বা সরল সুদ (Simple Interest) হারাম নয়।[৮৩]

সংশয় নিরসন-২

আমরা বিভিন্নভাবে তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গির অসারতা প্রমাণ করতে পারি–

১. সুদ নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত সূরা আল-বাকারার আয়াতটি এ সংক্রান্ত সূরা আলে ইমরানের আয়াতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। এ আয়াতটি সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হওয়া সম্পর্কে উমর ও ইবনে আব্বাসের মতামত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

এমনকি বর্ণিত আছে, উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাত্র ১১ অথবা ৯ অথবা ৭ দিন বেঁচে ছিলেন।[৮৪]

অতএব বুঝা যাচ্ছে, আলে ইমরানের আয়াতে রিবার নিষেধাজ্ঞার যে সীমাবদ্ধতা এসেছে তা সামগ্রিকভাবে রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার একটি পরিক্রমা, যা আমরা 'রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার পরিক্রমা' অংশে ব্যাখ্যা করেছি। পক্ষান্তরে রক্ত হারাম হওয়া সংক্রান্ত সূরা মায়েদার সাধারণ ঘোষণার পরেই সূরা আনয়ামের বিশেষ ঘোষণা এসেছে, যার দ্বারা উদ্দেশ্য হারাম রক্তের ক্ষেত্রকে সীমিতকরণ।

২. ইলমে উসূলে ফিক্হর স্বীকৃত নিয়ম এটাই যে, কোন নসে বর্ণিত সীমাবদ্ধতা যদি অতিরিক্ত অর্থে বা প্রচলিত অবস্থার বিশ্লেষণ স্বরূপ অথবা শরয়ী বিধান প্রণয়নের হিকমতের ইঙ্গিত বহন করে, তবে এ সীমাবদ্ধতাকে বিধিবদ্ধ আইন হিসেবে নয় বরং আইনের অতিরিক্ত বিশ্লেষণ হিসেবে নিতে হবে। এ জন্য আলে ইমরানের আয়াতে বর্ণিত চক্রবৃদ্ধি সুদের উল্লেখ রিবার নিষেধাজ্ঞাকে শুধু এ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে না; বরং এটা সে যুগের মানুষেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে রিবার লেনদেন করত সেই চক্রবৃদ্ধি রিবাকে নিষিদ্ধ করে। অতএব চক্রবৃদ্ধি সুদের উল্লেখ দ্বারা সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয় বরং চলমান প্রেক্ষাপট বর্ণনাই উদ্দেশ্য।[৮৫]

৩. তারা সূরা আলে ইমরানের আয়াত থেকে যে প্রমাণ পেশ করতে চেয়েছেন তা আয়াতের মর্মার্থের বিপরীত অর্থগ্রহণের মাধ্যমে দলীল পেশের নামান্তর। ইলমে ফিকহের দৃষ্টিতে এ জাতীয় দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, বরং পরিত্যাজ্য। কেননা 'সকল প্রকার সুদ নিষিদ্ধ' এ ব্যাপারে ইজমা সংগঠিত হয়েছে; আর ইজমার হুকুম রহিত করার জন্য অনুরূপ আরেকটি ইজমা প্রয়োজন।[৮৬]

৪. যদি কোন বিধান বর্ণনায় কোন সীমাবদ্ধতা উল্লেখিত হয় এবং তার অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে তবে সে ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার হুকুমই কার্যকর হয়। কিন্তু যদি তার অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে তবে সে ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার হুকুম প্রমাণ হিসেবে বিবেচ্য হয় না। যেমন আল্লাহর বাণী: "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমরা যাদের সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের ক্রোড়ে (লালন-পালনে) রয়েছে।"[৮৭]

আয়াতে স্ত্রীদের অন্য ঘরের কন্যাদের সংগে বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখানে "তোমাদের ক্রোড়ে" দ্বারা সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করা হয়েছে। তার মানে এই নয় যে, স্ত্রীর যে সব কন্যা অন্যত্র লালিত পালিত হবে তাদের সাথে বিবাহ বৈধ। বরং এ ক্ষেত্রে "তোমাদের ক্রোড়ে" দ্বারা সীমিতকরণের এক বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে তা হল, তৎকালীন জাহেলী আরবে স্বক্রোড়ে লালিত পালিত হওয়া সত্ত্বেও

স্ত্রীর অন্য ঘরের মেয়েকে বিবাহ্ করা বৈধ মনে করা হতো। এ জন্য আল্লাহ বিশেষ করে এ শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন।[৮৮]

একই ভাবে আল্লাহর বাণী, "দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না।"[৮৯]

এখানে গরীব বা নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার ভয়ে সন্তান হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু এ দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে, সন্তান হত্যার নিষেধাজ্ঞা শুধু এ ক্ষেত্রেই সীমিত। বরং সমস্ত আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, এ পরিসরসহ কোন অবস্থাতেই সন্তান হত্যা বৈধ নয়।[৯০]

৫. তারা শুধু চক্রবৃদ্ধি হারের সুদকেই নিষিদ্ধ বলেছেন এবং স্বল্প হারের সুদকে বৈধ বলেছেন। কিন্তু মহান আল্লাহর বাণী : "যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন পেয়ে যাবে।"[৯১]

এ আয়াত থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মূলধনের উপর নির্ভর করে বৈধতা অবৈধতা নির্ণিত হতে পারে না। কেননা সুদের যথাযথ হার নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। এম.এ. হামিদ বলেন, কিভাবে সুদের বিশেষ কোন হারকে 'খুব চড়া' বা 'খুব স্বল্প' হিসেবে বিবেচনা করা যাবে? সিনেমা বা পরিবহণ ব্যবসায়ের জন্য ২০% এর বেশী সুদের হারও 'খুব চড়া' বিবেচিত হয় না। অথচ ছোট মুদি দোকানের জন্য ৫%এর মত স্বল্প হারের সুদকেও 'খুব চড়া' মনে হতে পারে।[৯২]

উপরোক্ত বিষয়াদি বিবেচনান্তে বলা যায়, সূরা আল-বাকারার আ[illegible]তে রিবার সাধারণ নিষেধজ্ঞা এবং আলে ইমরানের আয়াতে রিবার সীমাবদ্ধ নিষেধাজ্ঞার মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য নেই। উভয় আয়াতই রিবাকে [illegible] করে মাত্র যে পরিমাণেরই হোক না কেন।

সংশয়-৩ : কুরআনে নিষিদ্ধ রিবা হল ঋণের বিপরীতে প্রদেয়

এ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারীরা মনে করেন, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন জাহেলী যুগের যে রিবা নিষিদ্ধ করেছে তা হল, ঋণের অর্থ পরিশো[illegible] করার দায়ে ঋণগ্রহীতাকে যে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয় তাই। অতএব ঋণ প্রদানের সময় অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের চুক্তি করে নেয়া এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না। সাইয়্যেদ রশীদ রেজা এ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারীদের অন্যতম। তিনি বলেন, "কুরআনে নিষিদ্ধ রিবা দ্বারা রিবা আল-নাসিয়্যাহই উদ্দেশ্য, যা ঋণ পরিশোধে বিলম্বিত হওয়ায় অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের নামান্তর। কিন্তু কুরআনের এ নিষেধাজ্ঞা ঋণ প্রদানের সময়ে কৃত চুক্তির বিনিময়ে প্রদেয় অতিরিক্ত অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে না। কেননা এ প্রবৃদ্ধি এ সম্পদ থেকে

উপকার গ্রহণের বিনিময় হিসেবে নেয়া হয়, বিলম্বে পরিশোধের কারণে নয়।[৯৩] তিনি অন্যত্র আরো বলেন, "মূলকথা হিসেবে আমরা আবারও পুনরাবৃত্তি করব যে, কুরআনে নিষিদ্ধ রিবা দ্বারা ঋণ পরিশোধে বিলম্বের জরিমানা স্বরূপ ঋণের সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য প্রদেয় অতিরিক্ত অর্থই উদ্দেশ্য। তাই উক্ত ঋণ ব্যবসায়িক ঋণ হোক বা সাধারণ কর্জ হোক অথবা অন্য কিছু হোক। সুতরাং ঋণ গ্রহণের সময় ঋণদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে ঋণদাতাকে মুনাফা হিসেবে যে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয় তা এ নিষেধাজ্ঞার পর্যায়ে পড়ে না।"[৯৪]

এ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারীদের মধ্যে আরও রয়েছেন, শাইখ আব্দুল ওয়াহাব খাল্লাফ। তারা এ দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে নিম্নোক্ত যুক্তি পেশ করেন–

১. কাতাদা, আতা, যায়েদ ইবনে আসলাম প্রমুখ তাবেঈর উক্তি যা আল্লামা ইবনে জারীর তাবারীসহ অন্যান্য মুফাস্সির বর্ণনা করেছেন; তা থেকে প্রমাণিত হয়, তারা জাহেলী যুগের রিবাকে বিলম্বে পরিশোধের বিপরীত ঋণের উপর প্রদত্ত প্রবৃদ্ধির মধ্যে সীমিত করেছেন।
২. এ ব্যাপারে সকল মুফাস্সির একমত যে, আল্লাহর বাণী, "তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না" আয়াতটি জাহেলী যুগের রিবা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা এ ব্যাপারেও একমত যে, সে রিবা যথা সময়ে ঋণ পরিশোধে অক্ষমতার কারণে গ্রহণ করা হতো।
৩. ইমাম আহমদকে যখন প্রশ্ন করা হয়, কোন রিবার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই? তখন তিনি উত্তর দেন, সেটা হল ঋণের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে বলে তুমি কি ঋণ পরিশোধ করবে নাকি রিবা দিবে? অত:পর সে যদি তা পরিশোধে অপারগ হয় তবে সম্পদের প্রবৃদ্ধির বিনিময়ে সময় বৃদ্ধি করা হয়। আর এটাই সন্দেহহীন রিবা।[৯৫]

সংশয় নিরসন-৩

নিম্নোক্ত যুক্তির মাধ্যমে আমরা তাদের এ সংশয় নিরসন করব–

১. মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের স্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে জাহেলী যুগে প্রচলিত ঋণ পরিশোধে বিলম্বের বিপরীতে প্রদেয় অতিরিক্ত অর্থকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই উক্ত অতিরিক্ত অর্থ ঋণ গ্রহণের সময় কৃত শর্তের ভিত্তিতে নির্ধারিত হোক অথবা ঋণ ছাড়ানোর সময়ে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত হোক। বরং এটাই স্বাভাবিক যে, এ নির্ধারণীটি ঋণ প্রদানের সময়ে দেয়া হয় এবং সময় শেষে তা আবার নবায়ন করা হয়। আর এ অর্থেই অর্থাৎ ঋণ প্রদানের সময় অতিরিক্ত অর্থসহ ঋণ পরিশোধ করার শর্তারোপ প্রাচীন কাল থেকেই রিবা শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে

আসছে। ইসলামের আবির্ভাব কালে এ পদ্ধতিরই লেনদেন ছিল। পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে এ পদ্ধতিকেই হারাম করা হয়েছিল। ইয়াহুদীদের ক্ষেত্রে রিবা বলতে আল-কুরআন যা বুঝিয়েছে তা হল, অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে ঋণ দেয়া। আল্লাহ্ বলেন : "বস্তুত ইয়াহুদীদের জন্য আমি হারাম করে দিয়েছি অনেক পূত-পবিত্র বস্তু যা তাদের জন্য হালাল ছিল– তাদের পাপের কারণে এবং আল্লাহর পথে অধিক পরিমাণ বাধাদামের কারণে। আর এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করত, অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে তারা অপরের সম্পদ ভক্ষণ করত অন্যায় পন্থায়, বস্তুত আমি কাফিরদের জন্য তৈরি করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব।"[৯৬]

আয়াতে বর্ণিত রিবা বলতে জাহেলী যুগে প্রচলিত রিবাকে বুঝানো হয়েছে; যা তাদের শরীয়তেও হারাম ছিল। কেননা আয়াতে রিবা শব্দের আগে আলিফ ও লাম যুক্ত করার মাধ্যমে একে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যার দ্বারা প্রচলিত প্রেক্ষাপটই উদ্দেশ্য।[৯৭]

২. আল-কুরআন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, মূলধনের উপর প্রবৃদ্ধিই রিবা। আল্লাহ বলেন, "যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন পেয়ে যাবে; ফলত: তোমরা কারো প্রতি অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না।"[৯৮]

এ ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয় যে, মূলধনই আসল সম্পত্তি। আর এর উপর যে কোন ধরণের প্রবৃদ্ধিই রিবা যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ কারণে আল্লাহ এখানে তওবার প্রসংগ এনেছেন। কারণ মূলধনের উপর কোন প্রকার প্রবৃদ্ধি গ্রহণ করলে খোদায়ী বিধানের বিরোধিতা করার মাধ্যমে অপরাধ করবে এবং সে ক্ষেত্রে তওবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে।

৩. তারা প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সিরগণের উক্তি ও ইমাম আহমদের সন্দেহহীন রিবা সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব থেকে প্রমাণ দেখিয়ে রিবা আল-নাসিয়্যার যে ব্যাখ্যা করেছেন তা যথাযথ নয়। কারণ জাহেলী যুগে শুধু ঋণের মেয়াদ বাড়ানোর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের শর্তই রিবা আল-নাসিয়্যাহ হিসেবে ব্যবহৃত হত তা নয়, বরং এটা ছিল তৎকালীন আরবের সর্বাধিক পরিচিত একটি রূপ মাত্র। এটা রিবার বিভিন্ন প্রকৃতির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এছাড়াও তারা অন্যান্য পদ্ধতিতেও রিবার লেনদেন করতো। আল্লামা জাস্‌সাস, রাযীসহ অনেক প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণ দেখিয়েছেন, জাহেলী যুগে ঋণ পরিশোধে বিলম্বিত হওয়ার কারণে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে নতুন সময়সীমা নির্ধারণ করা হতো, আবার সময়ের ব্যবধান অনুযায়ী ঋণের চুক্তির সময় অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের শর্ত প্রদান করা হতো।[৯৯]

সংশয়-৪ : দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে প্রদেয় রিবা বৈধ

এ সময়ের কিছু কিছু ব্যক্তি মনে করেন, আল্লাহর বাণী : "কেবলমাত্র তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ।"[১০০] আয়াতটি প্রমাণ করে যে, রিবা যদি পারস্পরিক সন্তুষ্টিচিত্তে হয় তবে তা বৈধ।[১০১]

সংশয় নিরসন-৪

তাদের এ ধারণা অমূলক ও ভিত্তিহীন। কেননা আয়াতে ব্যবহৃত "পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে" বাক্যটি শুধু আল্লাহর হালাল কৃত বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রিবা বা এ জাতীয় হারাম বস্তুর ক্ষেত্রে নয়। যেমন যেনা-ব্যভিচার দু'পক্ষের সন্তুষ্টির ভিত্তিতেই হয়ে থাকে, তাই বলে কি তা বৈধ হয়ে যাবে। হাদীস ও ফিকহের কিতাবে এমন অনেক ব্যবসার উল্লেখ রয়েছে যা উভয়ের সন্তুষ্টি চিত্তে হলেও বৈধ নয়। যেমন মুহাকালাহ, তালাকিয়ে জালব, বাই মাজহুল ইত্যাদি। এমনকি হাদীস ও ফিকহের গ্রন্থে অবৈধ ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত স্বতন্ত্র অধ্যায়ও রয়েছে। অতএব আল্লাহর বিধানের বিপরীতে সম্পদ বিনিময়ের ক্ষেত্রে শর্তযুক্ত কোন চুক্তি গ্রহণীয় নয়।

সংশয়-৫ : রিবা ব্যবসায়িক মুনাফার মত

মহান আল্লাহ আরবদের প্রসংগ উল্লেখ করেছেন যারা মনে করত এবং যুক্তিও দেখাতো যে, রিবা ও ব্যবসা একই। কারণ উভয় থেকে মূলধনের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয়। ব্যবসার ক্ষেত্রে অর্থ নগদে পাওয়া যায় এবং রিবার ক্ষেত্রে এটা বিলম্বিত হয়। এ ছাড়া দু'য়ের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই।

সংশয় নিরসন-৫

তাদের এ দাবি এ কারণে অযৌক্তিক যে, ব্যবসায়িক মুনাফার পিছনে পণ্যের মালিকের সেবা ও সাধনা যুক্ত থাকে। ফলতঃ সে তার শ্রমের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ পায়; কিন্তু রিবার বিষয় সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার শ্রম ছাড়াই ঋণ পরিশোধে বিলম্বিত হওয়ার বিপরীতে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয়।

নৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে রিবা ও ব্যবসার মধ্যে যে সব মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা হল–

১. ব্যবসার ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের স্বার্থ ও উপকার নিহিত থাকে। পারস্পরিক সম্মতিতে ও উভয়ের স্বার্থ রক্ষা করেই এটা সম্পাদিত হয়। পণ্য ক্রয়ের জন্য ক্রেতার উপর বাধ্যবাধকতা থাকে না। এ ক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে উভয়ের মুখাপেক্ষী থাকে। অন্য দিকে সুদের ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের ক্ষেত্রে

উপকারের বিনিময় হয় না। কারণ রিবার ঋণদাতা এককভাবে ঋণগ্রহীতার উপর শর্ত চাপিয়ে দেয়। সুদের বেলায় ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার মুখাপেক্ষী থাকে না।

২. ব্যবসা থেকে বিক্রেতা যে মুনাফা অর্জন করে তা একবারই। পক্ষান্তরে সুদে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতা থেকে বারংবার অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের সুবিধা ভোগ করে।

৩. ব্যবসা, শিল্প, কৃষিতে মানুষ তার পরিশ্রম ও সময় দুটোই ব্যয় করে। এর বিনিময়ে সে মুনাফা অর্জন করে। পক্ষান্তরে সুদী লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার পরিশ্রম ও সময় ব্যয় ছাড়াই অন্যের ঘাম ঝরানো উপার্জনে অংশিদারিত্ব সাব্যস্ত করা হয়।

রিবা ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে এম.এ হামিদ[১০২] চমৎকার বর্ণনা করেছেন : "অনেকে আছেন যারা স্বেচ্ছায় বা জ্ঞাতসারেই অথবা অনিচ্ছায় অজ্ঞাতসারে সুদকে মুনাফার সাথে এক করে দেখার চেষ্টা করেন। মনে রাখা দরকার দুটো ধারণাতেই মৌলিক পার্থক্য রয়েছে–

রিবা ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য

রিবা	মুনাফা
১. সংজ্ঞা অনুসারে রিবা হল ঋণের শর্ত অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণদাতাকে মূলধনের সাথে প্রদেয় বাড়তি অর্থ।	১. সংজ্ঞা অনুসারে মুনাফা হল, উৎপাদনের মূল্য ও উৎপাদন খরচের পার্থক্য।
২. এটা পূর্ব নির্ধারিত। সুতরাং ঋণদাতার কোন ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা নেই।	২. এটা পরে নির্ধারিত হয়। সুতরাং মূলধন সরবরাহকারী ও উদ্যোক্তা উভয়ের ক্ষেত্রেই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বিদ্যমান।
৩. রিবা কখনই ঋণাত্মক হতে পারে না। বড় জোর খুবই কম বা শূন্য হতে পারে।	৩. মুনাফা ধনাত্মক, শূন্য এমনকি ঋণাত্মকও হতে পারে ।
৪. ইসলামী শরীআর দৃষ্টিকোণ থেকে এটি হারাম।	৪. ইসলামী শরীআর দৃষ্টিকোণ থেকে এটি হালাল।

রিবা সংক্রান্ত এ সংশয়টি আবহমানকাল ধরে উপস্থাপিত হয়ে আসছে। মহান আল্লাহ আল-কুরআনে জাহেলী যুগের লোকদের আলোচনা করেছেন। যারা এ সংশয় পোষণ করত মহান আল্লাহ তাদের সে সংশয় নিরসনে উল্লেখ করে বলেন, "যারা সুদ খায়

তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যে ভাবে দণ্ডায়মান হবে ঐ ব্যক্তি যাকে শয়তান আছর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলে, ক্রয়- বিক্রয়ও তো সুদের মত। অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।"[১০৩]

সংশয়-৬ : সঞ্চয়ী ফান্ড বা সঞ্চয়ী জামানত

ব্যাংকে জমাকৃত সঞ্চয়ী ফান্ড বা সঞ্চয়ী জামানত থেকে প্রাপ্ত অতিরিক্ত অর্থ তথা সুদকে অনেকে বৈধ মনে করেন। বলা হয়ে থাকে, ইমাম মুহাম্মদ আব্দুহু র. এর বৈধতার ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছেন। মুহাম্মদ উমারা যিনি "আল-আমালুল কামিলাহ লিল ইমাম মুহাম্মদ আব্দুহু" (ইমাম মুহাম্মদ আব্দুহুর কর্মসমগ্র) শিরোনামে ৬ খণ্ডের সিরিজ সংকলন করেন এবং সঞ্চয়ী ফান্ড থেকে প্রাপ্ত সুদের অর্থের বিধান সম্পর্কিত তিনটি ফতোয়া প্রকাশ করেন– তিনি মনে করেন ইমাম মুহাম্মদ আব্দুহু এ ধরনের অতিরিক্ত অর্থের বৈধতা দিয়েছেন।[১০৪]

সংশয় নিরসন-৬

যে তিনটি ফতোয়া থেকে প্রমাণ দেখিয়ে মুহাম্মদ উমারা ধারণা করেছেন যে, মুহাম্মদ আব্দুহু ব্যাংকিং জামানত বা সঞ্চয়ী ফান্ড থেকে প্রাপ্ত অতিরিক্ত অর্থ বৈধ করেছেন সে ফতোয়া তিনটি প্রশ্নের শাব্দিক ও মর্মার্থ বিশ্লেষণে বুঝা যায়, প্রশ্ন তিনটি মূলতঃ ব্যবসায়িক অংশিদারিত্বের শর্তে এক ব্যক্তি কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ প্রদান, যাতে ঐ অর্থ ব্যবসায়ে খাটানোর অনুমতি থাকে এবং মেয়াদ শেষে মূলধনসহ লভ্যাংশের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ সম্পর্কিত ছিল।

আর ইমাম মুহাম্মদ আব্দুহু এ প্রশ্নের জবাবে যে তিনটি ফতোয়া প্রদান করেছিলেন, সেগুলোর ভাষা একই এবং এমন ছিল যে, "উল্লেখিত ক্ষেত্রে মূলধন প্রদান মুদারাবার পর্যায়ভুক্ত হবে, যা সম্পূর্ণ জায়েয। যদি কেউ তার সম্পদ ব্যবসায়ে খাটায় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের পর তা থেকে মুনাফা গ্রহণ করে তবে তা অবৈধ হবে না।"[১০৫]

ইমাম মুহাম্মদ আব্দুহুর জবাব ও তাঁর প্রদত্ত ফতোয়া থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, জিজ্ঞাসা ও জবাব দুটোই সার্বিক দিক থেকে সহীহ মুদারাবা ভিত্তিক। ইসলামের দৃষ্টিতে মুদারাবাহ বলা হয়, দুই ব্যক্তির মধ্যকার অংশিদারিত্ব যাদের একজন মূলধনের যোগান দেয় এবং অন্যজন শ্রমের যোগান দেয়। অতঃপর তাদের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে মূলধনদাতার জন্য লভ্যাংশের অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ এবং বাকি অংশ শ্রমদানকারীর জন্য নির্ধারিত হয়। আর ইমাম আব্দুহু এ বিষয়ে ফতোয়া প্রদান করেন।

অতএব ইমাম আব্দুহুর সাথে সম্পর্কিত করে যা বলা হয় যে, তিনি ব্যাংকিং জামানত তথা সঞ্চয়ী ফান্ড থেকে প্রাপ্ত সুদী অর্থ গ্রহণের বৈধতা দিয়েছেন তা এক ভিত্তিহীন কথা। কেননা এ জাতীয় এবং যে কোন প্রকার সুদী অর্থ গ্রহণ ইসলামে সম্পূর্ণ অবৈধ। ইমাম আব্দুহুর এ মন্তব্য আলোচনা করতে যেয়ে ইব্রাহীম যাকী উদ্দিন বাদয়ী তার "নজরীয়্যাতুর রিবা আল মুহরিম ফিশ্ শরীয়াতিল ইসলামিয়্যাহ" গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, মুহাম্মদ উমারা কর্তৃক ইমাম আব্দুহুর এ মন্তব্যের ব্যাখ্যা ভুল ও অসঙ্গত অনুধাবনের নামান্তর।[১০৬]

এ ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, যদি ইমাম আব্দুহু এ ধরনের অর্থ গ্রহণ বৈধ মনে করেও থাকেন তবুও তা বৈধ হবে না। কারণ ইসলাম তার নির্ধারিত বিধান পালনকেই আবশ্যিক করেছে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির আনুগত্যকে নয়। সুতরাং ইসলামের অনুসারীদের উচিৎ কারো মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে সত্যের অনুসরণ করা।

সংশয়-৭ : অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন

এ সংশয় পোষণকারীরা মনে করেন, যে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে রিবা নিষিদ্ধ হয়েছিল তা বর্তমানে পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান সময়ে রিবা এক মানবিক প্রয়োজন হিসেবে দেখা দিয়েছে। ফলতঃ এটার নিষেধাজ্ঞা শিথিল হয়ে গেছে। কারণ বিশেষ প্রয়োজনের সময় অবৈধ জিনিসও বৈধতায় রূপ নেয়। যেমনঃ প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যদি কিছু না খেলে তার জীবন চলে যাওয়ার আশংকা করে তবে তার জন্য মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস ইত্যাদি নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ বৈধ। এ ধারণা পোষণকারীদের অন্যতম ড. মারুফ আদ্দাওয়ালিবী।[১০৭]

সংশয় নিরসন-৭

প্রথমতঃ ইসলামের আনুগত্য প্রদর্শনকারী কারো পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, যে সব বিষয় আল্লাহ ও তাঁর রসূল হারাম ঘোষণা করেছেন সে সব বিষয়ের ব্যাপারে এ ধরনের মন্তব্য করবে যে, "এ নিষেধাজ্ঞাটি মানব কল্যাণ বিরোধী"। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার কল্যাণ-অকল্যাণের ব্যাপারে তাদের চেয়ে বেশি জ্ঞাত। তিনিই রিবা নিষিদ্ধ করেছেন। সুতরাং তাঁর সে নির্দেশ মাথা পেতে নেয়া উচিৎ। আল্লাহর বাণীঃ "আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে তাদের সে আদেশের ব্যাপারে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না।"[১০৮]

দ্বিতীয়তঃ যে সব অসহায় অবস্থা ও জরুরী প্রয়োজন নিষেধাজ্ঞাকে বৈধ করে সে বিধানের রূপায়ণ রিবার ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কেননা ঋণ গ্রহীতা বিপদে পড়ে

প্রয়োজনের তাগিদে ঋণ গ্রহণ করে ঠিকই কিন্তু ব্যাংকে টাকা জমাদানকারী বা ঋণদাতা তার মূলধন থেকে যে সুদ গ্রহণ করে তা অসহায় হয়ে নয় বা জরুরী প্রয়োজনে পড়ে নয়। যে ব্যক্তি নিজেই সম্পদের মালিক সে অন্যের সম্পদের মুখাপেক্ষী হতে পারে না। সুতরাং তার ব্যাপারটি নিম্নোক্ত আল্লাহর বাণী থেকে উদ্ভাবিত উসূলে ফিক্হর "প্রয়োজন নিষেধাজ্ঞা বৈধতা দেয়" মূলনীতির পর্যায়ে পড়ে না। আল্লাহ বলেন, "তিনি তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, কিন্তু সেগুলোও তোমাদের জন্য হালাল যখন তোমরা নিরুপায় হয়ে যাও।"[১০৯]

প্রত্যেক জ্ঞানবান মানুষের কাছে এটা স্পষ্ট যে, অসহায় অবস্থা বা বিশেষ প্রয়োজন বলতে ঐ প্রয়োজনকে বুঝায় যা ছাড়া জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে বা শরীরের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারানোর সম্ভাবনা দেখা যায়। রিবার প্রয়োজন কি এ শ্রেণীভুক্ত? বৈধ উপার্জনের সকল রাস্তা কি বন্ধ?

ইমাম আবু যাহরা বলেন, এমন কোন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নেই যে ক্ষেত্রে ইসলাম রিবার বৈধতা প্রদান করে। প্রয়োজনে রিবার আশ্রয় নেয়ার বৈধতা বিষয়ক সুদী ব্যবস্থার দাবি শরীয়ত সম্মত নয়। বরং তা মানুষের মধ্যে দৃঢ় সংকল্পের ঘাটতি এনে দেয় এবং তার আবেগকে দুর্বল করে দেয়।[১১০]

সংশয়-৮ : সামাজিক কল্যাণে বৈধ

এ সংশয়ের মূল দাবি হল, যদি সুদের পেছনে ব্যক্তি বা সমাজের কল্যাণ নিহত থাকে তবে তা বৈধ। কেননা মাসালিহে মুরসালাহ বা ব্যাপক কল্যাণমূলক চিন্তা শরীয়তের দলীলসমূহের অন্যতম দলীল। যার উপর আমল করা আবশ্যক। শায়খ আব্দুল জলীল ঈসা এ সংশয়ের প্রবক্তা।[১১১]

আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রফেসর শায়খ মাহমুদ সালতুত থেকেও এ ধরনের একটি মন্তব্য পাওয়া যায়। তিনি বলেন: "সর্বস্তরের জনগণের কল্যাণ সাধিত হয় এমন সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য ব্যাংক থেকে সুদী ঋণ গ্রহণ করা রাষ্ট্রের জন্য বৈধ। এভাবে ব্যবসায়ীদের জন্য সুদী ঋণ গ্রহণ করা বৈধ, কেননা তারা এ দ্বারা জনসাধারণের উপকারার্থে পণ্যসামগ্রী আমদানী করে।[১১২]

সংশয় নিরসন-৮

তাদের এ দাবি এজন্য অগ্রাহ্য যে, মাসালিহে মুরসালাহ বা ব্যাপক কল্যাণমূলক চিন্তা কখনো আল্লাহর হারামকৃত বিষয়কে হালাল করতে পারে না বা তার হালালকৃত বিষয়কে হারাম করতে পারে না।

তাদের এ সংশয় নিরসনকল্পে উসূলে ফিকহের দৃষ্টিতে মাসালিহে মুরসালাহর সংজ্ঞা ও শর্তাবলী উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। উসূলে ফিক্হ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে, মাসালিহে মুরসালাহ আইন প্রণয়নের এমন এক উপাদান যার বৈধতা প্রমাণ করলে সাধারণ জনগণের কোন আশু সংকটের অবসান হয় অথবা কোন কল্যাণ সাধিত হয় এবং শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে যার বৈধতা বা নিষেধাজ্ঞার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। উপরন্তু যা ইসলামী শরীয়তের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।[১১৩]

এ সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট হয়, মাসালিহে মুরসালাহ হল শরীয়তের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গত ঐসব কল্যাণ চিন্তা যার বৈধতা– অবৈধতার ব্যাপারে কোন শরয়ী দলীল নেই।

আলিমগণের মতে ইমাম মালিক র. সর্বপ্রথম মাসালিহে মুরসালাহকে আইন প্রণয়নের উৎস হিসেবে গণনা করেন। ইমাম শাতিবী দেখিয়েছেন, ইমাম মালিক মাসালিহে মুরসালাহকে আইন প্রণয়নের উৎস হিসেবে বিবেচনার ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত প্রদান করেছেন।[১১৪]

- ❖ কল্যাণ চিন্তা ও শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। শরীয়তের কোন মূলনীতি বা কোন দলীলের সাথে এটা সংঘর্ষিক হবে না।
- ❖ সত্ত্বাগতভাবে বিষয়টি বিবেক সম্মত হতে হবে। কোন বিবেকবানের সামনে যখন সেটা উপস্থাপিত হবে তখন সাধারণ বিবেক–বুদ্ধি যেন তাকে সমর্থন করে।
- ❖ তা গ্রহণের ক্ষেত্রে শর্ত হল, এর দ্বারা যেন নিশ্চিত কোন সংকটের অবসান হয় এবং যদি এটা গ্রহণ করা না হয় তবে মানুষের চরম সংকটের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

অতএব মাসালিহে মুরসালাহর সংজ্ঞা ও শর্ত বর্ণনান্তে আমরা বলতে পারি, যারা মানব কল্যাণের দোহাই দিয়ে রিবাকে বৈধ করতে চান তাদের সে যুক্তি ভিত্তিহীন। কেননা কোন দিক থেকেই রিবার বৈধতা-অবৈধতা কল্যাণ চিন্তার সাথে সম্পৃক্ত নয়। কারণ রিবার নিষেধাজ্ঞা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার ভিত্তিতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত। পক্ষান্তরে মানব কল্যাণে কোন কিছুর বৈধতার শর্ত হল, তার বৈধতা বা অবৈধতার ব্যাপারে শরয়ী কোন প্রমাণ থাকবে না। সুতরাং তাদের দাবি অগ্রাহ্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শায়খুল আযহার মাহমুদ শালতুত মৃত্যুর পূর্বে মানব কল্যাণে রিবা বৈধ হওয়ার সংক্রান্ত মন্তব্য প্রত্যাহার করেন।[১১৫]

সংশয়-৯ : ঋণদাতার ক্ষতিপূরণ

কেউ কেউ বলেন, ঋণ প্রদান করলে ঋণদাতার বেশ ক্ষতিই হয়। কারণ তার টাকা ব্যবসায়ে খাটালে মূলধন বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং রিবা যেহেতু ঋণদাতার সে

ক্ষতিটা পুষিয়ে দেয় সেহেতু রিবা গ্রহণ যুক্তিসঙ্গত। তাছাড়া ঋণ পরিশোধে বিলম্বের জরিমানা স্বরূপও এটা গ্রহণ করা যেতে পারে।[১১৬]

সংশয় নিরসন-৯

ঋণদাতার মূলধনের ক্ষতি হওয়ার বিষয়টি ধারণাপ্রসূত, যা হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। এজন্য একটি ধারণাপ্রসূত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ঋণগ্রহীতা থেকে বাধ্যতামূলক অতিরিক্ত অর্থগ্রহণ যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না।

ইসলামী শরীয়তে ঋণ প্রদানের সময় ঋণগ্রহীতা থেকে জামানত হিসেবে কোন কিছু বন্ধক রাখার বিধান রয়েছে।[১১৭] কিন্তু সম্ভাব্য ক্ষতির কারণে কোন অতিরিক্ত মূল্য বা মুনাফা গ্রহণের কোন বিধান শরীয়তে নেই।

ঋণ পরিশোধের বিলম্বের জরিমানার যে প্রসঙ্গ টেনে তারা রিবাকে বৈধ মনে করেছেন আমরা তার জবাবে বলব, ইসলামী শরীয়ত ঋণ পরিশোধে বিলম্বের জন্য আলাদা কোন মূল্য নির্ধারণ করে না। কেননা ঋণ আদান-প্রদান একটি মানবিক ব্যাপার, ভ্রাতৃত্বের দাবি এবং পরস্পরের প্রতি পরস্পরের দায়িত্বানুভূতির প্রমাণ। এটা সম্পদ অর্জনের কোন পদ্ধতি নয়। সুতরাং এর জন্য আলাদা কোন প্রতিদান কামনা করা উচিৎ নয়। কেননা এ মহান সহানুভূতি ও সহমর্মিতার প্রতিদান কোন মানুষের পক্ষে পার্থিব কোন সম্পদ দিয়ে প্রদান করা সম্ভব নয়। এর প্রতিদান একমাত্র তিনিই দিতে পারেন যিনি সকল কল্যাণের উৎস, যিনি সকল সম্পদের মালিক। এর প্রতিদান কেবল হতে পারে অনন্ত, অবিনশ্বর কোন বিনিময়ের মাধ্যমে। আল্লাহ্ বলেন : "যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেয়া উচিৎ। আর যদি ক্ষমা করে দাও তা খুবই উত্তম।"[১১৮] তিনি আরও বলেন, "এমন কে আছে যে আল্লাহকে ঋণ দেবে উত্তম ঋণ; অতএব আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহই সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন।"[১১৯]

এটা তাদের পুরস্কার যারা কোন প্রকার অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের ইচ্ছা ছাড়াই সহযোগিতার উদ্দেশ্যে অন্যকে ঋণ প্রদান করে।

সংশয়-১০ : ভোগ্য সম্পদ থেকে রিবা গ্রহণ হারাম

ইসলামী শরীয়তের অনভিজ্ঞ কিছু ব্যক্তি ধারণা করেন, ইসলাম যে রিবা নিষিদ্ধ করেছে তা শুধু ভোগ্য সম্পদ যেমন– খাদ্য, পানীয়, ঔষধ ইত্যাদি থেকে গ্রহণীয় বাড়তি। উৎপাদনশীল সম্পদ থেকে নেয়া বাড়তিকে নিষিদ্ধ করেনি। কারণ ভোগ্য সম্পদ থেকে কোন বাড়তি সুবিধা ভোগ করা অমানবিক ও অনৈতিক। পক্ষান্তরে

উৎপাদম কাজে ঋণ প্রদান করে তা থেকে মুনাফা অর্জন যুক্তিসংগত। কেননা এই ঋণ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনের অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হয়।

তারা এ ধারণাও পোষণ করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরণ ও কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার দিনগুলোতে যে রিবা প্রচলিত ছিল তা মূলতঃ ভোগ্য সম্পদের উপর প্রদেয়। সুতরাং এছাড়া অন্য ক্ষেত্রে রিবার হুকুম প্রযোজ্য নয়।[১২০]

সংশয় নিরসন-১০

রিবার নিষেধাজ্ঞা মূলধনের এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা। যে সক্ষম সে নিজে একাই অথবা অন্যের সাথে মিশে মূলধনকে কাজে খাটাবে। আর যে সক্ষম হবে না তার করণীয় হবে মূলধনের বিনিয়োগ করা। সে মূলধন বিনিয়োগ করবে অন্যপক্ষ শ্রম প্রয়োগ করবে এবং লাভ-ক্ষতি উভয়ের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হবে। যদি উৎপাদনে লোকসান হয় তবে শ্রমিকের শ্রম ও প্রচেষ্টা এবং পুঁজিপতির পুঁজি উভয়ই লোকসান হবে এটাই ন্যায়সঙ্গত দাবি। কিন্তু রিবার মধ্যে উৎপাদনে লাভ হোক আর লোকসান হোক পুঁজিপতি সবসময় লাভবান হয়। পক্ষান্তরে লোকসান হলে শুধু এক পক্ষই লোকসানের শিকার হয়।

দ্বিতীয়ত, রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণপঞ্জী স্পষ্টভাবে বর্ণিত। এ নিষেধাজ্ঞা সকল প্রকার রিবাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এছাড়া তারা যেটা মনে করেন যে, ভোগ্য সম্পদের ক্ষেত্রে রিবা গ্রহণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে এর বিপরীত প্রমাণ মিলে। কেননা জাহেলী যুগে বেশির ভাগ রিবাই উৎপাদনশীল সম্পদ ভিত্তিক ছিল। এটা স্পষ্ট যে, আরবরা ব্যবসায়িক লেনদেনে অভ্যস্ত ছিল। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী কুরাইশদের ছিল গ্রীষ্ম ও শীতকালীন দু'টি বাণিজ্য বহর। আর এ জাতীয় কর্মকাণ্ডে পর্যাপ্ত অর্থের প্রয়োজন হয়। এজন্যই 'ব্যবসায়িক ঋণ' শব্দ তাদের নিকট অতি পরিচিত একটি শব্দ। এ বিষয়ে আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি। পক্ষান্তরে তাদের প্রদত্ত ঋণ শুধু ভোগ্য সম্পদের ক্ষেত্রে সীমিত ছিল একথার কোন দলীল নেই। সুতরাং তাদের দাবি অসঙ্গত। বরং কুরআন-সুন্নাহর দলীল প্রমাণ ও ঐতিহাসিক বর্ণনা এটাই প্রমাণ করে যে, জাহেলী যুগে রিবার বিনিময়ে প্রদত্ত ঋণ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত ছিল।

সংশয়-১১ : রিবা বাইয়ে মুয়াজ্জালের ন্যায়

দাবি করা হয়, রিবা বাইয়ে মুয়াজ্জালের মত। কেননা জমহুর ফোকাহার ঐকমত্য অনুযায়ী বাইয়ে মুয়াজ্জালের ক্ষেত্রে নির্ধারিত মূল্যের উপর বৃদ্ধিসহ বিলম্বে দ্রব্যমূল্য

পরিশোধ বৈধ। অতএব রিবাও বৈধ, কেননা রিবাতেও মূলধনের উপর বৃদ্ধিসহ বিলম্বে ঋণ পরিশোধ করা হয়।[১২১]

এ প্রসংগে তারা ইবনে আব্বাস রা. বর্ণিত ও ইবনে তাইমিয়া র. উদ্ধৃত হাদীসটি দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন, "নগদে কিনে বাকিতে বিক্রয়, মুদ্রা দিয়ে মুদ্রা নেয়ার মত।"[১২২]

সংশয় নিরসন-১১

এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাইয়ে মুয়াজ্জাল একটি ব্যবসা যা আল্লাহ হালাল করেছেন। আর তারা যার প্রতি আহ্বান করেছে তা হল রিবা বা সুদ যা আল্লাহ হারাম করেছেন। বিশ্লেষকগণের নিকট বাইয়ে মুয়াজ্জাল ও রিবার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

ব্যবসার ক্ষেত্রে স্থান কাল পাত্র ভেদে দ্রব্যমূল্য ওঠানামা হতে পারে। এ জন্য শরীয়তে বাইয়ে মুয়াজ্জল বৈধ। কিন্তু নগদ সম্পদের ক্ষেত্রে তা অসম্ভব। কেননা টাকার মূল্য সব সময়ই একই। এ ক্ষেত্রে আরো যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হল, বাইয়ে মুয়াজ্জালে দ্রব্য ও তার মূল্যই প্রধান ইস্যু থাকে, বাড়তি কোন মুনাফা সেখানে অবান্তর। কেননা দ্রব্যমূল্য কখনো বৃদ্ধি পায় আবার কমে। পক্ষান্তরে রিবার মধ্যে খাতকের অর্থনৈতিক অবস্থা যাই হোক না কেন বাড়তি অর্থের পরিমাণ নির্ধারিত থাকে। অতএব বাইয়ে মুয়াজ্জাল ও রিবা এক হতে পারে না।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের লিখিত "কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের বিবিধ অনুষঙ্গ ও তার ইসলামী বিধান" শীর্ষক প্রবন্ধ[১২৩] দেখা যেতে পারে। প্রাসাঙ্গিক হিসেবে প্রবন্ধের কিছু আলোচনা এখানে তুলে ধরা হল–

... এ জাতীয় অভিযোগের মূল কারণ হল, আধুনিক পুঁজিবাদি দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবসায়িক লেনদেনে পণ্য এবং মুদ্রার মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। পারস্পরিক লেনদেনে পণ্য এবং মুদ্রার সাথে সমান আচরণ করা হয়। কিন্তু ইসলামী নীতিমালা এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে না। ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী মুদ্রা (নগদ টাকা) ও পণ্যের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ কারণে এগুলোর বিধানও ভিন্ন ভিন্ন। মুদ্রা (Money) এবং পণ্যের (Commodity) মধ্যে পার্থক্যের মৌলিক বিষয়গুলো নিম্নরূপ–

১. মুদ্রার নিজস্ব কোন মূল্য (Value) নেই। এর দ্বারা সরাসরি মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা যায় না। বরং এগুলো পণ্য বা সেবা অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে পণ্যের নিজস্ব মূল্য (Value) রয়েছে। এগুলোকে অন্য কোন জিনিসে রূপান্তর করা ছাড়াই সরাসরি এ দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।

২. পণ্য গুণ ও মানের দিক থেকে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। পক্ষান্তরে মুদ্রা শুধু মূল্য নির্ধারণ ও আদান-প্রদানের মাধ্যম। এজন্যই মুদ্রার যে কোন মূল্য মানের একটি একক তার আরেকটি এককের একশ' পার্সেন্টের সমান। পাঁচশ' টাকার পুরাতন এবং ময়লাযুক্ত একটি নোট পাঁচশ' টাকার নতুন আরেকটি নোটের একশ' পার্সেন্ট সমতুল্য। অথচ পণ্য বিভিন্ন মানদণ্ডের হতে পারে। একটি ব্যবহৃত পুরাতন গাড়ির মূল্য একটি নতুন গাড়ি অপেক্ষা অনেক কম হয়।

৩. পণ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি একটি নির্দিষ্ট টার্গেটের উপর হয়, কমপক্ষে উক্ত টার্গেটের গুণাগুণ নির্দিষ্ট হয়। যেমন 'ক' যদি একটি নির্দিষ্ট গাড়িকে টার্গেট করে তা ক্রয় করে এবং বিক্রেতা তাতে একমত হয় তবে সেই গাড়িটির ক্ষেত্রেই ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান আরোপিত হয়। বিক্রেতা ঐ গাড়ির পরিবর্তে অন্য আরেকটি গাড়ি নিতে ক্রেতাকে বাধ্য করতে পারে না। যদিও অন্য গাড়িটি একই জাতীয় ও একই মানের হয়। পক্ষান্তরে কোন লেনদেনে মুদ্রা নির্দিষ্ট করা যায় না। 'ক' যদি 'খ' থেকে কোন জিনিস পাঁচশ টাকার একটি নির্দিষ্ট নোট দেখিয়ে ক্রয় করে, তাহলেও সে উক্ত নোটের স্থলে সেই মূল্যমানের অন্য নোট প্রদান করতে পারবে।

৪. আধুনিক লেনদেনে মুদ্রার অস্তিত্বও অনেক সময় দৃষ্টিগোচর হয় না। যেমন– ব্যাংক কার্ডের মাধ্যমে লেনদেন করে যা বর্তমান সময়ে প্লাস্টিক মানি হিসেবে পরিচিত। কিন্তু পণ্যদ্রব্যের অস্তিত্ব ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় কল্পনাহীন।

এসব পার্থক্যকে সামনে রেখে ইসলাম পণ্য ও মুদ্রার সাথে পৃথক পৃথক আচরণ করে। মুদ্রার যেহেতু নিজস্ব কোন ভ্যালু নেই, তা শুধু লেনদেনের মাধ্যম, যার মান ও গুণগত দিক বলতে কিছুই নেই। সে কারণে মুদ্রার একটি একক সেই মূল্যমানের আরেকটি এককের বিনিময়ে শুধু সমান সমান হতে পারে। যদি কেউ এক হাজার টাকার একটি নোটের লেনদেন করে তবে দ্বিতীয় পক্ষের মুদ্রাও এক হাজার টাকার নোটের সমমূল্যের হতে হবে। তবে পণ্যের ক্ষেত্রে অবস্থা এর চেয়ে ভিন্ন রূপ। অতএব যখন টাকার বিনিময়ে টাকার লেনদেন করা হবে তখন ক্রয়-বিক্রয় নগদ হোক বা বাকিতে হোক কোন অবস্থাতেই কম বশি করা যাবে না। কিন্তু যখন টাকার বিনিময়ে পণ্য বিক্রি করা হবে তখন ক্রয়-বিক্রয় নগদ হোক আর বাকিতে হোক তখন উভয় পক্ষের সম্মতিতে নির্ধারিত মূল্য বাজারদরের চেয়ে বেশি হতেও পারবে। পণ্যমূল্য পরিশোধের সময়ের ব্যবধান মূল্য নির্ধারণের একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। তবে এটি টাকার বিনিময়ে টাকার লেনদেনের মত নয়, কেননা এক্ষেত্রে অতিরিক্ত টাকা শুধুমাত্র সময়ের ব্যবধানের বিপরীতেই হয়ে থাকে। বরং এ মাসআলাটি চার মাযহাবের ইমামগণের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য। তাঁরা বলেন, বিক্রেতা যদি কোন জিনিসের নগদ এবং বাকি বিক্রয়ের

জন্য পৃথক পৃথক দাম নির্ধারণ করে এবং বাকি বিক্রয়ের মূল্য নগদ বিক্রয়ের মূল্যের চেয়ে বেশি হয় তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বৈধ হবে।[১২৪]

উপসংহার

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, রিবা মানবতার জন্য অভিশাপ। এর নানাবিধ অপকারিতা ও ক্ষতিকারক প্রভাবের জন্য ইসলামে তা নিষিদ্ধ। এ নিষেধাজ্ঞা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, রসূলের সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের মাধ্যমে অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এ ক্ষেত্রে কারো কোন ইখতিয়ার নেই, যারা রিবাকে বৈধ করার জন্য এর বিভিন্ন বিষয়ে সন্দেহ–সংশয়ের উপস্থাপন করেন। তারা মূলত নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে এমনটি করেন। কেননা মহান আল্লাহই তার বান্দাদের কল্যাণ–অকল্যাণ এর ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত। আর তিনিই মানবতার কল্যাণের জন্য রিবাকে নিষিদ্ধ করেছেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কোন সংশয় বা অবান্তর প্রশ্ন উত্থাপন করা তাঁর সে বিধানের অবজ্ঞা করারই নামান্তর।

তথ্যনির্দেশ

১. ইবনে মাজাহ, ইমাম, *আস্‌সুনান,* বৈরুত : দারুল ফিকর, তা.বি., অধ্যায়- আত্‌তিজারাত, অনুচ্ছেদ : আত্‌তাগলিজ ফীর রিবা, খ.২, পৃ.৭৬৬, হাদীস নং-২২৭৮
লيأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا آكل الربا فمن لم يأكل أصابه من غباره

২. যামখশারী, ইমাম, *আসাসুল বালাগাত,* বৈরুত : মাতবায়াতে আওলাদে আওরেফান, খ্রি. ১৯৫২, পৃ.১৫৩

৩. আল-কুরআন, ৩০:৩৯

৪. আল কুরআন, ৬৯:১০

৫. আররাযী, ইমাম, *মুখতারুসসীহাহ,* বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল ইসলামিয়্যাহ খ্রি.১৯৯৪, পৃ.২১৬

৬. আল-কুরআন, ২২:৫

৭. ইবনে কাছীর, ইমাম, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম,* বৈরুতঃ দারুল মারেফা, খ্রি.১৯৮৭, খ.৩, পৃ.২১৬

৮. আল-কুরআন, ১৬:৯২

৯. শাওকানী, ইমাম, *ফাতহুল কাদীর,* আল-কাহেরা : মাকতাবাহ ওয়া মাতবাআতে মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী ওয়া আওলাদুহু, খ্রি.১৯৬৪, খ.৩, পৃ.১৯১

১০. ফিরোযাবাদী, মুহম্মদ ইবনে ইয়াকুব, *আল-কামুসুল মুহীত,* আল-কাহেরা : মাতবাআতে আমীরিয়্যাহ, ১৪০২, খ.৪, পৃ.৩২৬

১১. আল-কুরআন, ১৩:১৭

১২. আল-কুরআন, ২৩:৫০

১৩. ইবনুল আছির, ইমাম, *আননিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীস ওয়াল আছার,* বৈরুত : মাকতাবাতে ইসলামিয়্যাহ, খ্রি. ১৯৬৩, খ.২, পৃ.১৯২

[১৪]. আল-কুরআন, ২:২৭৬

[১৫]. শাওকানী, ইমাম, *ফাতহুল কাদীর,* তা.বি. প্রাগুক্ত খ.১, পৃ.২৯৬ ينمي الصدقات في الدنيا بالبركة و يكثر ثوابها بالتضعيف في الآخرة

[১৬]. আফ্রীকী, ইবনে মানজুর, *লিসানুল আরব,* বৈরুত : দারু সাদের, তা. বি., খ.১৪, পৃ.৩০৪-৩০৫

[১৭]. প্রাগুক্ত

[১৮]. নববী, ইমাম, *তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত,* বৈরুত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, তা. বি., খ.১, পৃ.১১৭

[১৯]. আইনী, আল্লামা বদরুদ্দীন, *উমদাতুল ক্বারী,* বৈরুত : দারুল ফিকর, খ্রি.১৯৭৯, খ.১২, পৃ.১৯৯

[২০]. আরাবী, কাযী ইবনুল, *আহকামুল কুরআন,* আল-কাহেরা : ঈসা আল-বাবী আল-হালবী এন্ড কোং, ১৯৬৯, খ.১, পৃ.২৪২

[২১]. আল-মাকদাসী, ইবনে কুদামাহ, *আল-মুগনী,* রিয়াদ, আল-কাহেরা : মাকতাবাতে রিয়াদ আল-হাদীসাহ, খ্রি. ১৯৮০, খ.৪, পৃ.৩

[২২]. আসকালানী, ইবনে হাজার, *ফাতহুল বারী,* আল-কাহেরা : খ্রি.১৯৫২, খ.৪, পৃ.২৫

[২৩]. ইবনে আবেদীন, *তাসবীরুল আফসার,* আল-কাহেরা : মাকতাবাতে ইয়ামামিয়্যাহ, ১২২৭ হিঃ, খ.৫, পৃ.১৬৯

[২৪]. আল-খারশী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ, *শরহে মুখতাসারে খলীল,* আল-কাহেরা : মাতবাআতে আমীরিয়্যাহ, খ্রি. ১৮৯৯ খ.৫, পৃ.৫৬

[২৫]. সাঈদী, মুহাম্মদ আহমাদ, *আল-আদিল্লাতুল অকীয়্যাহ ফী ইদাহিল মুয়ামালাতুর রুবুবিয়্যাহ,* রিয়াদ : মাতবাআতে দারুল হিলাল, তা.বি. পৃ.১১

[২৬]. ইবনে কুদামা, *আল-মুগনী,* প্রাগুক্ত খ.৪, পৃ.৩

[২৭]. আল-খাতীব, মাহমুদ ইবনে ইব্রাহীম, *মিন মাবাদী আল-ইক্তেসাদিল ইসলামী,* রিয়াদ : মাকতাবাতুত তাওবাহ, খ্রি.১৯৯৭, পৃ.৯৮

[২৮]. Chapra, M. Umer, *Towards a just Monetary System,* Leicester, Islamic Foundation, 1985, p.-56-57.

[২৯]. হামিদ, এম.এ. *ইসলামী অর্থনীতি: একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ,* রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অর্থনীতি বিভাগ, খ্রি.১৯৯৯, পৃ.১৪৩।

[৩০]. ওসমানী, ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ, *ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যে ইসলামী রূপরেখা,* ঢাকা : জাবাল-এ-নুর প্রকাশনী, খ্রি.২০০৭, পৃ.২২

[৩১]. প্রাগুক্ত, পৃ.২১

[৩২]. কুরতুবী, ইমাম, *আল-জামি লি আহকামুল কুরআন,* মিসর, খ্রি. ১৯৭৬, খ.৩, পৃ.৩৪৮

[৩৩]. তাবারী, মুহাম্মদ ইবনে জারীর, *জামিউল বায়ান,* আল-কাহেরা : দারুল ফিকর, খ্রি. ১৯৮৪, খ.২১, পৃ.২৭

[৩৪]. মুত্তাকী, আলাউদ্দীন আলী, *কানযুল উম্মাল,* দায়িরাতুল মাআরিফ, খ্রি. ১৮৯৪, খ.২, পৃ.২১৪, হাদীস নং-১৩২

[৩৫]. আল-খাতীব, মাহমুদ *মিন মাবাদী আল-ইক্তেসাদিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৬

[৩৬]. আল-জাওযীয়াহ, ইবনে কাইয়্যিম, *ই'লামুল মুওয়াক্কীঈন*, বৈরুত : দারুল ফিকরুল আরাবী, খ্রি. ১৯৭৬ খ.২, পৃ.১৩৫

[৩৭]. আল-জাস্সাস, আবু বকর, *আহকামুল কুরআন*, আল-কাহেরা : আল-মাতবাআতে আল-বাহিয়্যাহ আল-মিসরিয়্যাহ, খ্রি.১৯২৮, খ.১, পৃ.৪৬৫

[৩৮]. আমীন, ডক্টর, হাসান আব্দুল্লাহ, *আল-অদায়িউল মাসরাফীয়্যাহ আন-নুকুদিয়্যাহ ওয়া ইসতেছমারুহা ফীল ইসলাম*, রিয়াদ : দারুশ্শুরুক্ব, খ্রি.১৯৮৩, পৃ.২৭৪

[৩৯]. হাম্মাদ, ডক্টর, হামদ ইবনে, *আর-রিবা খাতরুহু ওয়া সাবিলুল খালাস মিনহু*, রিয়াদ : আল-বুহুছুল ইসলামিয়্যা ওয়াল ইফতা ওয়াদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ, খ্রি. ১৯৮৬, পৃ.১৫

[৪০]. আস্সারাখসী, শামসুল হক, আয়েম্মা, *আল-মাবসুত*, বৈরুত : দারুল মারেফা, তা. বি., খ.১২, পৃ.১০৯

[৪১]. আল-জাওযীয়াহ, ইবনুল কাইয়্যিম, *ই'লামুল মুওয়াক্কীঈন*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.১৩৫

[৪২]. মুসলিম, ইমাম *আস্সহীহ*, রিয়াদ : খ্রি. ১৯৭৯, খ.৩ পৃ.১২১১

الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلا بمثل سواءً بسواءٍ يداً بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.

[৪৩]. আল-কুরআন, ৪: ১৬০১৬১

[৪৪]. বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য: আবু সাহেবাহ, ডক্টর মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ, *হুলুল ফি মুশকিলাতুর রিবা*, আল-কাহেরা : মাকতাবাতুস্ সুন্নাহ, পৃ.৬২৬৪

[৪৫]. আল-কুরআন, ১১:৮৭

[৪৬]. *ইঞ্জিল লূক*, অধ্যায়-০৬, স্তবক৩৪ ও ৩৫

[৪৭]. আবু সাহেবাহ, ডক্টর মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ, *হুলুল ফি মুশকিলাতুর রিবা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৪

[৪৮]. Corpration, Americana, *Encyclopedia Americana* (International Edition), New York-1977, V-27, p.-821(USURY).

[৪৯]. প্রাগুক্ত

[৫০]. ইবনে হিশাম, আসসীরাতুন্নাববীয়্যাহ, আল-কাহেরা : মাকতাবাতে আল-কুল্লীয়াহ আল-আযহারীয়্যা,
খ্রি.১৯৭৪, খ.১, পৃ.১৭৯

[৫১]. Mills and Presley, *Prohabitation of interest in Wastern Lateraturе,* Lecture deliverd at the Fifth intensive course on Islamic Economics, Banking and Finance, organized by the Islamic Foundation of Laciccster ২৫-২৮ September 1997. তথ্যসূত্র: হামিদ, এম.এ., *ইসলামী অর্থনীতি*, পৃ.১৪৪

[৫২]. আল-কুরআন, ২: ২৭৫

[৫৩]. আল-কুরআন, ২: ২৭৮

[৫৪]. তাবারী, মুহাম্মদ ইবনে জারীর, *জামিউল বায়ান*, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ.২২

[৫৫]. আইনী, আল্লামা বদর উদ্দীন, *উমদাতুল কারী*, প্রাগুক্ত, খ.১১, পৃ.২০০

[৫৬]. আল-কুরআন, ২: ২৭৯

[৫৭]. আল-কুরআন, ৩: ১৩০

[৫৮]. মুসলিম, ইমাম, *আস্‌সহীহ্*, অধ্যায় : আল মাসাকাত, অনুচ্ছেদ : লুয়িনা আকিলুর রিবা ওয়া মুকিলিহি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১০৬ لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله و كاتبه وشاهديه و قال هم سواء

[৫৯]. মুসলিম, ইমাম, *আসসহীহ* অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : বায়ানিল কাবাঈর ওয়া আকবারুহা, প্রাগুক্ত

হাদীস নং-১৪৫

اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله و ماهن؟ قال: الشرك بالله و السحر و قتل النفس التي حرم الله إلا بحق الإسلام و أكل الربا و أكل مال اليتيم و التولي يوم الزحف و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات.

[৬০]. আল-বান্না, আহমাদ আব্দুর রহমান, *আল-ফাতহুর রব্বানী লি তারতীবে মুসনাদিল ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল*, আল-কাহেরা : দারুশ শিহাব, তা. বি. খ.১৫, পৃ.৬৯

درهم ربا يأكله الرجل أشد على الله من ستة و ثلاثون زينة.

[৬১]. কুরতুবী, ইমাম কুরতুবী, *আল-জামে লি আহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.২৯৪

[৬২]. ছিনতাইকারি সমাজের শান্তি নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে বিধায় তাকে সন্ত্রাসীদের পর্যায়ভুক্ত করা হয়। এ শ্রেণীর মানুষের শাস্তি সূরা আল-মায়েদার ৩৩ নং আয়াতে (৫:৩৩) বর্ণিত হয়েছে।

[৬৩]. জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৫৬০

[৬৪]. ইব্‌ন কাছীর, ইমাম, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৩৩০

[৬৫]. সাবুনী, মুহাম্মদ আলী, *রাওয়াইউল বায়ান ফী তাফসীরি আয়াতিল আহকাম মিনাল কুরআন*, রিয়াদ : দারুস্‌সালাম, খ্রি.১৯৯৭, খ.১, পৃ.৩৬৪-৩৬৭

[৬৬]. আল-কুরআন, ৩০:৩৯

[৬৭]. আল-কুরআন, ৪: ১৬০-১৬১

[৬৮]. আল-কুরআন, ৩:১৩০

[৬৯]. আল-কুরআন, ২:২৭৮

[৭০]. উদ্দীন, সালাহ, *মুখতাসারুল ইতকান ফী উলুমিল কুরআন লিস সুয়ুতী*, রিয়াদ : দারুন নাফায়েস,

তা. বি. পৃ.৬১

[৭১]. উসমানী, বিচারপতি মাওলানা তাকী, *ইসলাহী খুতুবাত*, অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ উমায়ের কোব্বাদী, ঢাকা : দারুল উলূম লাইব্রেরি, ২০০৯, খ.৭, পৃ.৯৫-৯৬

[৭২]. ওসমানী, ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ, *ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ইসলামী রূপরেখা*,

পৃ.৪৩-৪৪

[৭৩]. উসমানী, বিচারপতি মাওলানা তাকী, *ইসলাহী খুতুবাত*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.৯৮
[৭৪]. ওসমানী, ড. মাওলানা *ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ইসলামী রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫০
[৭৫]. প্রাগুক্ত
[৭৬]. তাবারী, ইবনে জরীর, *জামিউল বায়ান*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৫৫
[৭৭]. মুসলিম, ইমাম, *আস্‌সহীহ*, অধ্যায় : হাজ্জ, অনুচ্ছেদ : হুজ্জাতুন নাবী স. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১২১৮
و ربا الجاهلية موضوع، و أول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله.
[৭৮]. উসমানী, বিচারপতি মাওলানা তাকী, *ইসলাহী খুতুবাত*, প্রাগুক্ত খ.৭, পৃ.৯৯
[৭৯]. ইবনে সাদ, মুহাম্মদ, *আত্‌তাবাকাত*, বৈরুতঃ দারে বৈরুত, খ্রি.১৯৫৭ খ.৩, পৃ.১০৯
[৮০]. উসমানী, বিচারপতি মাওলানা তাকী, *ইসলাহী খুতুবাত*, প্রাগুক্ত খ.৭, পৃ.১০১
[৮১]. আল-কুরআন, ৫:০৩
[৮২]. আল-কুরআন, ৬:১৪৫
[৮৩]. এ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারীদের শিরোনামে রয়েছেঃ *'আল ইসলাম দীনুল ফিতরাহ'* গ্রন্থের লেখক শাইখ আব্দুল আযীয জাউস। মিসর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের দারুল উলূম ইনিস্টিটিইটে লেকচার প্রদান কালে তিনি এ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেন, যা পরবর্তীতে মাসিক *'আল দাওয়া'*-এর ১৬ তম সংখ্যায় (এপ্রিল ১৯০৮ ইং) 'বহুছুন ফির রিবা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়
[৮৪]. আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ.২০৫
[৮৫]. খাল্লাফ, আব্দুল ওয়াহাব, *বাহুছুন আনিল ফাওয়ায়িদিল মাদফুয়াহ ওয়ার রিবা*, আল-কাহেরা : দাওয়ায়ে ইসলাম, খ্রি. ১৯৫১
[৮৬]. সাঈদী, আহমদ, *আল আদিল্লাতুল ওয়াফিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫২
[৮৭]. আল-কুরআন, ৪:২৩
[৮৮]. খাল্লাফ, আব্দুল ওয়াহাব, *বাহুছুন আনিল ফাওয়ায়িদিল মাদফুয়াহ ওয়ার রিবা*
[৮৯]. আল-কুরআন, ১৭:৩১
[৯০]. সাঈদী, আহমদ, *আল আদিল্লাতুল ওয়াফিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৩
[৯১]. আল-কুরআন, খ্রি. ১৯৫৯, ২:২৭৯
[৯২]. হামিদ, এম এ, *ইসলামী অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪২
[৯৩]. রেজা, সাইয়েদ রশিদ, *আর রিবা ওয়াল মুয়ামালাত ফীল ইসলাম*, আল-কাহেরা : মাকতাবাতে কাহেরাহ, খ্রি. ১৩৭৯, পৃ.৫১
[৯৪]. প্রাগুক্ত, পৃ.৮৩
[৯৫]. আমীন, ড. হাসান আব্দুল্লাহ, *আল-অদায়িউল মাসরাফিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৬.
[৯৬]. আল-কুরআন, ৪:১৬০-১৬১
[৯৭]. যাকি উদ্দিন, ইব্রাহীম, *নাজরিয়াতুর রিবা আল মুহরিম ফীশ শরীয়াতিল ইসলামিয়্যাহ*, কায়রো, আল-মজলিসুল আলা লি রিয়াতিল ফুনুন আদাব, খ্রি. ১৯৬৪, পৃ.৩২

[৯৮]. আল-কুরআন, ২:২৭৯

[৯৯]. জাসাস, *আহকামুল কুরআন,* প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৪৬৪

[১০০]. আল-কুরআন, ৪:২৯

[১০১]. হাম্মাদ, ড. হামদ ইবনে, *আর রিবা,* প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬

[১০২]. হামিদ, *ইসলামী অর্থনীতি,* প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৩-১৪৪

[১০৩]. আল-কুরআন, ২:২৭৫

[১০৪]. *দৈনিক আল-আহরাম,* মিসর, ১৬/৫/১৯৭৫, (ধর্মদর্শন পৃ.)।

[১০৫]. প্রাগুক্ত

[১০৬]. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪

[১০৭]. সাঈদী, আহমাদ, *আল-আদিল্লাতুল ওয়াফিয়্যাহ,* প্রাগুক্ত, পৃ.৫৩

[১০৮]. আল-কুরআন, ৩৩:৩৬

[১০৯]. আল-কুরআন, ৬:১১৯

[১১০]. আবু যাহরাহ, ইমাম, *আর রিবা,* প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬

[১১১]. প্রাগুক্ত

[১১২]. *ফাতওয়া শিশ্শায়খ মাহমুদ শালতুত :* তা. বি. পৃ.৩৩৫

[১১৩]. কাত্তান, মান্নাউল, *আত্ তাশরীহ ওয়াল ফিকহ্ ফীল ইসলাম,* মাকতাবাতে ওহাবাহ্, খ্রি. ১৯৭৬, পৃ.২২৩

[১১৪]. শাতিবী, ইমাম, *আল-ইতিসাম,* বৈরুত : দারুল মাআরিফা, খ্রি. ১৯৮১, প্রাগুক্ত খ.২, পৃ.১২৯.

[১১৫]. সাঈদী আহমদ, *আল-আদিল্লাতুল ওয়াফিয়্যাহ,* প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫

[১১৬]. আবু সাহেবাহ, *হুলুল লি মুশকিলাতুর রিবা,* পৃ.৮৭

[১১৭]. আল-কুরআনে (০২:২৮২ ও ২৮৩) এ সম্পর্কিত বিধান বর্ণিত হয়েছে।

[১১৮]. আল-কুরআন, ২:২৮০

[১১৯]. আল-কুরআন, ২:২৪৫

[১২০]. হাম্মাদ, ড. হামদ ইবনে, *রিবা,* প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭-৩৮

[১২১]. প্রাগুক্ত, পৃ.৪২

[১২২]. ইবনে তাইমিয়া, ইমাম, *মাজমু' ফাতওয়া,* বৈরুত : দারুল ওয়াফা, খ্রি.২০০৫, খ.২৯, পৃ.৪৪৬

[১২৩]. আমিন, মুহাম্মদ রুহুল, কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের বিবিধ অনুষঙ্গ ও তার ইসলামী বিধান, *ইসলামী আইন ও বিচার,* ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, বর্ষ-৬, সংখ্যা-২২, (এপ্রিল-জুন) ২০১০

[১২৪]. প্রাগুক্ত, পৃ.৫২-৫৪

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ঃ ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৪, পৃষ্ঠা ৪৫-৭০

দাম্পত্য বিরোধ নিষ্পত্তির উপায় : কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি

ড. মোঃ শামছুল আলম*

[সারসংক্ষেপ : কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় মানুষ, তাই কুরআন মানব জীবনের সকল সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে কথা বলে। জীবনে চলার পথে মানুষ যেসব জায়গায় সমস্যার সম্মুখীন হয় সেখানেই কুরআন সুষ্ঠু ও নির্ভুল সমাধান দিতে এগিয়ে আসে। বিয়ে, সংসার এবং দাম্পত্য জীবন মানব জীবনের অপরিহার্য অংশ। সে জন্য কুরআন এর প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে কথা বলেছে। এক কথায় বলা যায়, কুরআন মানব জীবনে সৃষ্ট সকল সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পথ উন্মুক্ত রেখেছে। কুরআন এমন এক জীবনাদর্শ যেখানে সংকটে পড়ে আটকে থাকার কোনো কারণ নেই বরং আছে সংকট থেকে বেরিয়ে আসার সুস্পষ্ট নির্দেশনা। কুরআন সকল প্রকার বিরোধের বিপক্ষে এবং সকল প্রকার নিষ্পত্তির পক্ষে।]

কুরআন হলো নিষ্কৃতি, নিষ্পত্তি, মীমাংসা, মুক্তি ও সমাধানের শেষ ঠিকানা। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বেশ কিছু কথা বলা হয়েছে। যেমন– মহান আল্লাহ্ বলেছেন,
"তুমি কষ্ট পাবে এ জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি।"[১]
"আল্লাহ্ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না।"[২]
"তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।"[৩]
"কাজেই কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ হয়, ততটুকু আবৃত্তি কর।"[৪]
"কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?"[৫]
"আল্লাহ্ কারো উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত।"[৬]
কুরআন থেকে বিরোধ নিষ্পত্তির এমনি আরো অসংখ্য প্রমাণ পেশ করা যাবে। অতএব শুধু দাম্পত্য জীবন নয়; বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে জীবন যাতে নিষ্কন্টক ও সহজ হয় কুর'আন সে ব্যবস্থা করে রেখেছে। এক কথায় বলা যায়, বিরোধ নিষ্পত্তিতে কুর'আনের কোন বিকল্প নেই। এ ব্যাপারে মানুষ কুরআন থেকে যত

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বেশি শিক্ষা গ্রহণ করবে তত বেশি লাভবান হবে। বিশ্বের বর্তমান অশান্ত ও নাজুক অবস্থা এই বাস্তবতাকে আরো অনিবার্য করে তুলেছে। পাশাপাশি যাতে মানব সমাজ ও পরিবারে কোন ধরনের বিরোধ সৃষ্টি না হয় সে পন্থাও কুরআন বাতলে দিয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে দাম্পত্য শব্দটির অর্থ জানা প্রয়োজন। অভিধানে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, state of husband and wife; conjugal/matrimonial relationship.[7] দাম্পত্য জীবনকে সুখের নীড় বানানোর জন্য যা যা করণীয় তা বিস্তারিতভাবে কুরআন ও তাঁর মহান প্রচারক মুহাম্মদ স. বলে দিয়েছেন। দাম্পত্য জীবনের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কুরআন ব্যাপক তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করেছে। তবে সব সময় সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়াই উত্তম। কারণ বিরোধের পূর্বের অবস্থায় কখনো হুবহু ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। সমঝোতা মানে একটি ক্ষতের চিকিৎসা। কুরআন ও এর মহান প্রচারক সে কাজটিই করে গেছেন। এ জন্য পর্যায়ক্রমিক অনেক কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রাক-দাম্পত্য জীবনে করণীয়

যথাসময়ে দাম্পত্য জীবন শুরু করা : সব কিছুর একটি মোক্ষম সময় থাকে। দাম্পত্য জীবন শুরু করারও একটি সময় ও বয়স রয়েছে। এর ব্যত্যয় ঘটলে অনেক সময় বিপত্তি দেখা দেয়। অতএব শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সামর্থ্য যখন আসবে তখন আর দেরি না করাই ভাল। অনেকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অজুহাতে বেশি বয়সে কম বয়সী মেয়েকে বিয়ে করে থাকে। এতেও অনেক সময় সমস্যার উদ্ভব হয়। কারণ এক সময় পুরুষ লোকটি বৃদ্ধ হয়ে যায় যখন তার স্ত্রীর থাকে ভরা যৌবন। তখন মহিলাটির বিপথগামী হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। আর এ জন্য সংসারে বিরোধ সৃষ্টি হলে স্ত্রীকে দায়ী করা কোন বুদ্ধিমান সচেতন লোকের কাজ নয়।

বর-কনে পছন্দের সময় দীনদারি ও নৈতিকতাকে প্রাধান্য প্রদান

আজকাল কোথাও শান্তি নেই বললেই চলে। সর্বত্র কলহ, বিরোধ, হাহাকার, অশান্তি, সন্দেহ আর হতাশা বিরাজ করছে। এগুলো মানুষের কর্মের ফল। এর অন্যতম কারণ এই যে, মানুষ কখনো কখনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বিয়ের পাত্র বা পাত্রী নির্বাচন করে বা বিয়ে করে। অথবা বিয়েতে এমন সব বিষয়কে অধিক গুরুত্ব দেয় যা পরিশেষে জীবনকে দুর্বিষহ ও বিষময় করে তোলে। কনে নির্বাচনে ইসলামের কিছু সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "চারটি বৈশিষ্ট্যের কারণে সাধারণত কোন মেয়েকে বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ, তার সৌন্দর্য, তার বংশ মর্যাদা এবং তার দীনদারি। তবে তোমরা দীনদারিকে প্রাধান্য দাও।"[৮] রসূলুল্লাহ্ স. আরো বলেছেন, "তোমরা নারীর কেবল বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য দেখেই বিয়ে করো না। কেননা তাদের

এ রূপ-সৌন্দর্য তাদের নষ্ট ও বিপথগামী করে দিতে পারে। তাদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দেখেও বিয়ে করবে না। কেননা ধন-সম্পদ তাদের বিদ্রোহী ও দুর্বিনীত বানিয়ে দিতে পারে। বরং বিয়ে করো নারীর দীনদারির গুণ দেখে। মনে রাখবে, কৃষ্ণকায়া দাসীও যদি দীনদার হয় তবু সে অন্যদের তুলনায় উত্তম।"[৯]

আজকাল পাত্রী পছন্দ করা হয় উচ্চ বংশ, সৌন্দর্য, ডিগ্রী, চাকুরি ও সামাজিক অবস্থান বিবেচনা করে। কোন্ জায়গায় বিয়ে করলে বেশি যৌতুক পাওয়া যাবে বা আর্থিকভাবে বেশি লাভবান হওয়া যাবে সেটিই বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় বর পক্ষ থেকে। তাই এত অশান্তি ও বিরোধ। ইসলামে বিয়ের যে পবিত্র উদ্দেশ্য তা অনেকের বিয়েতেই উপেক্ষিত থাকে। বিয়েতে দীনদারিকে একেবারেই সবার শেষে বিবেচনা করা হয়। অথচ মহানবী স. দীনদারিকে অধিক গুরুত্ব দিতে বলেছেন। একজন দীনদার ও সৎ স্ত্রী যে কতটা কল্যাণকর তা সাময়িক ও বস্তুবাদি চিন্তায় বুঝা যায় না। কারণ তার স্বভাব-চরিত্রের ওপর ভিত্তি করেই সংসারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আসে, সন্তান-সন্ততি সৎ ও শিক্ষিত হয়ে ওঠে। সংসার সুখের ঠিকানায় পরিণত হয়। সংসারের সুখ অর্থ দিয়ে মাপা যায় না। সতী স্ত্রীর গুরুত্ব ও উপকারিতার কথা উল্লেখ করে রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "আল্লাহ্‌ভীতির পর মু'মিন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় সৎ স্ত্রীর মাধ্যমে।"[১০] যার স্ত্রী অথবা স্বামী অসৎ, অসচ্চরিত্র, বহুগামী সে বুঝতে পারে, অশান্তি কাকে বলে? অতএব বিয়ের সময়ই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, ব্যক্তি বিরোধ ও অশান্তিতে জড়াবে, না কি জড়াবে না। মহানবী স. আরো বলেছেন, "তোমরা সৎ পুরুষ ও নারীদের বিয়ে কর।"[১১] সৎ ও ভাল মানুষ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য বড় সম্পদ। সে পুরুষ হোক আর নারী। তাই রসূলুল্লাহ্ স. আবার বলেছেন, "সৎ নারী জগতের সবচেয়ে উত্তম সম্পদ।"[১২]

মহানবী স. আরো বলেন, "সৎ নারীর চেয়ে উত্তম কোন সম্পদ হতে পারে না।"[১৩] রসূলুল্লাহ্ স. আরো বলেছেন, "আদম সন্তানের সৌভাগ্য তিনটি আর দুর্ভাগ্য তিনটি। আদম সন্তানের সৌভাগ্য হলোঃ সৎ স্ত্রী, নিরাপদ আবাস ও নিখুঁত বাহন। আর আদম সন্তানের দুর্ভাগ্য হলোঃ অসৎ স্ত্রী, মন্দ বাসস্থান ও মন্দ বাহন।"[১৪] মহানবী স. আবার বলেছেন, "আল্লাহ্ যাকে সৎ স্ত্রী প্রদান করেন; তাকে দীনের অর্ধেক দিয়ে সাহায্য করেন। অতএব সে যেন দীনের অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে।"[১৫] আসলে সুখ এবং শান্তির ভিত যে কুর'আন ও হাদীস, তা মানুষকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। মানুষ তো বুঝে শুনেই যেন বিরোধ আর অশান্তিকে বরণ করে নিচ্ছে। সে বিয়েতে সততাকে কোন গুরুত্বই দিচ্ছে না। ইচ্ছে করে সে বিরোধে জড়িয়ে পড়ছে। সমাজে অনেক সৎ ও আদর্শবান পাত্রী রয়েছে অর্থাভাবে বা চেহারা

আকর্ষণীয় না হওয়ায় তাদের বিয়ে হচ্ছে না। আবার আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী বা ধনাঢ্য ব্যক্তির কন্যা হওয়ার কারণে দ্রুত বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। আসলে একটি জাতির পচন শুরু হলে সর্বত্র তার ঢেউ গিয়ে আছড়ে পড়ে। এটি পচনের একটি দিক।

বরকে সামর্থ্যবান হওয়ার যোগ্যতা অর্জন

সবার জন্য বিয়ে নয়। সবার জন্য দাম্পত্য জীবন নয়। কারণ অভাবে ভালবাসা অটুট থাকে না। তখন নানামুখি বিপত্তি দেখা দেয়। আবেগ দিয়ে অনেক কিছু সম্ভব হলেও সুখী দাম্পত্য জীবন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। আবেগ আর বাস্তবতা এক জিনিস নয়। যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না ইসলাম তাদের ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই আল্লাহ্ তাদের নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে।"[১৬] রসূলুল্লাহ্ স. আর্থিকভাবে অসমর্থ যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "আর যে ব্যক্তি বিয়ে করতে অক্ষম সে যেন সাওম পালন করে। কেননা সাওম তার যৌনক্ষুধাকে অবদমিত করে।"[১৭]

কারো আবদার বা পীড়াপীড়িতে বিয়ে না করা

অনেক সময় নিজের আগ্রহে বিয়ে না করলেও বিরোধ দেখা দেয়। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। ইসলামে কোন ব্যাপারেই জবরদস্তির স্থান নেই। বিয়ে জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। এর ওপর ভবিষ্যত জীবনের অনেক কিছু নির্ভর করে। এতে কাউকে খুশি করার জন্য কিংবা অযাচিত চাপের মুখে বিয়ে করা উচিত নয়।

বৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবন শুরু করা

আজকাল ছেলে-মেয়েরা একে অপরকে পছন্দ করে বাবা-মা'র ওপর চাপ সৃষ্টি করে, তারা বিয়ের পূর্বে একত্রে খায়, ঘুরাঘুরি করে, আড্ডা দেয় তারপর বিয়ে করে। কখনো এত কিছুর পরও বিয়ে করে না। অর্থাৎ তাদের বিয়ের পূর্বেই অনেক অবৈধ কাজ সংঘটিত হয়ে যায়। এমনটি যেহেতু ইসলাম সমর্থন করে না সেহেতু দাম্পত্য জীবনে তারা জীবনের হিসেব-নিকেশ করে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। এ জন্য আগে বিয়ে করে পরে প্রেম শুরু করতে হবে। বিয়ে করার পূর্বে ইসলামে তথাকথিত প্রেম-ভালোবাসার কোন প্রকার স্বীকৃতি নেই।

ইসলামী পদ্ধতিতে বিয়ে করা

ইসলাম বিয়ের ব্যাপারে এমন কিছু নিয়ম-পদ্ধতি প্রচলন করেছে যেগুলো মেনে নিয়ে বিয়ে করলে বরকত ও স্বাচ্ছন্দ্য আসে। নচেৎ কলহ সৃষ্টি হওয়ার দরজা খুলে যায়। যেমন– অপচয় করে বিয়ে করা, বিয়ের অনুষ্ঠানে অশ্লীল আচরণ করা, বিয়েকে জটিল ও দুরূহ করে ফেলা ইত্যাদি। ইদানিং বিয়েতে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় অনুপ্রবেশ করেছে। জটিলতা যেন দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। এখন ব্যাপারটি এমন দাঁড়িয়েছে যে, যেন এসব না হলে বিয়েই হবে না। যেমন গায়ে হলুদ, খাওয়ার পর অন্য কেউ হাত ধুয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এসব করে বিয়েকে অযথা জটিল করে ফেলা হয়েছে। মহানবী স. এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "তুলনামূলক সহজ বিয়েই সর্বোত্তম বিয়ে।"[১৮] অতএব এসব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় বিয়ে সম্পাদন করতে হবে।

মহান আল্লাহর নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করা

বিয়ের পূর্বে মানসিকতা ও চেতনাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। দাম্পত্য জীবন কোন রেওয়াজ নয়। এটি মহান আল্লাহর নিদর্শনের অংশ। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আর প্রত্যেক বস্তু আমি সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"[১৯]

বৈষয়িক কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা না করা

দাম্পত্য জীবনে বস্তুবাদি চিন্তা পরিহার করতে হবে। বিয়ে করার সময় যারা কনে পক্ষ থেকে কিছু পাওয়ার চিন্তায় বিভোর থাকে তারা দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে পারে না। বরং যে উদ্দেশ্যে ইসলাম বিয়ে করতে বলেছে; সে উদ্দেশ্যেই বিয়ে করতে হবে। তাহলেই সুখী দাম্পত্য জীবন লাভ করা সম্ভব হবে।

দাম্পত্য জীবনে করণীয় বিষয়সমূহ

স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের সহযোগী। উভয়ের সমঝোতা, সহযোগিতা এবং যৌথ প্রচেষ্টায় একটি সুন্দর সংসার গড়ে ওঠে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কি ধরনের হবে সে ব্যাপারে মুহাম্মদ স. এক অতুলনীয় মহান আদর্শ। তাঁর ব্যাপারে তাঁর স্ত্রীগণ চমৎকার ধারণা পোষণ করতেন। তিনিও তাদের ভূয়সী প্রশংসা করতেন। আসলে সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য এমন অবস্থাই কাম্য। স্ত্রী হয়ে স্বামীর ব্যাপারে যে কথা খাদীজা রা. বলেছিলেন তা সত্যিই প্রনিধানযোগ্য। রাসূলুল্লাহ্ স. প্রথম ওহী প্রাপ্ত হয়ে ঘরে ফিরে এসে খাদীজা রা.-কে ঘটিত সব বিষয় খুলে বললেন। খাদীজা রা. সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, "কখনো নয়, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ্ কখনো আপনাকে

অপমানিত করবেন না। নিশ্চিতভাবেই আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন। আপনি লোকদের বোঝা লাঘব করেন। আপনি অতিথি-সেবা করেন। আপনি নিঃস্বকে উপার্জনক্ষম করে তোলেন। আপনি সত্য প্রতিষ্ঠায় ব্রতীদের পাশে দাঁড়ান।"[২০]

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি কর্তব্য পালনে পরিবার একটি সুখের আবাসে পরিণত হয়। আবার কর্তব্যে অবহেলার কারণে পারিবারিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠতে পারে। আল-কুর'আনের চেতনা অনুযায়ী দাম্পত্য জীবন গড়ে তুললে বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবে না। সে জন্য কতিপয় বিষয়ের প্রতি দম্পতিদের গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। যেমন-

পরস্পর পরস্পরকে ভূষণ ও পরিচ্ছদ মনে করা

ভূষণ বা অলংকার যেমনি মানুষকে সৌন্দর্য মন্ডিত করে তেমনি স্বামী-স্ত্রীর এবং স্ত্রী স্বামীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। এ উপলব্ধি দু'জনের মধ্যে থাকতে হবে। তাহলে আর কলহ হবে না। সেখানে সৃষ্টি হবে মমত্ববোধ ও অকৃত্রিম ভালোবাসা। পরিচ্ছদ যেমনিভাবে মানুষের সম্মান বৃদ্ধি করে এবং সুন্দর করে তোলে তেমনি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দাম্পত্য জীবনকে সুন্দর ও সুখময় করে তোলে। পোশাক-পরিচ্ছদ যেমন মানুষকে ঠাণ্ডা, গরম, ধূলা-ময়লা থেকে রক্ষা করে, মানুষের সৌন্দর্য, মান-মর্যাদা বৃদ্ধি এবং ইজ্জত সম্ভ্রম সুরক্ষায় ভূমিকা পালনে সহায়তা করে, তেমনি স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের মান-মর্যাদা ও চরিত্র মাধুর্য রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পাপ-পঙ্কিলতা থেকেও মানুষের জীবন পূত-পবিত্র রাখে, বল্গাহীন পাশবিক জীবন থেকে বিরত রাখে। অতএব দাম্পত্য জীবনকে পূত-পবিত্র জীবন যাপনের রক্ষাকবচ বলা যায়। তা-ই পারস্পরিক সম্পর্ক প্রগাঢ় হলে বিরোধ বা কলহ দূরে থাক সে স্থান দখল করবে শান্তি ও সমৃদ্ধি। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারিক সম্পর্কের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।"[২১]

পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন

বিয়ে ও দাম্পত্য জীবন কোন খেল তামাশার বিষয় নয়। এতে বেশ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। আর এ উপলব্ধির অভাবে অনেকাংশে কলহ ও বিরোধ সৃষ্টি হয়। পরিবারে স্বামী-স্ত্রী একটি পাখির দু'টি পাখা। সুতরাং তাদের সমমর্যাদার ভিত্তিতে আচরণ করা প্রয়োজন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের।"[২২] মহানবী স. তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, "নারীদের সম্পর্কে তোমরা আল্লাহ্র ভয় রেখো। নিশ্চয়

তোমাদের যেমন নারীদের উপর হক (অধিকার) আছে, তদ্রূপ নারীদেরও তোমাদের উপর অধিকার আছে।"[২৩] আবার স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্বের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ স. আলাদা করে বলেছেন, "পুরুষ তার সংসারের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জওয়াবদিহি করবে। স্ত্রী তার স্বামীর, পরিজনের এবং সন্তানের তত্ত্বাবধায়ক। তাকে এদের ব্যাপারে জওয়াবদিহি করতে হবে।"[২৪]

একত্রে থাকা ও খাওয়া

অনেক সময় দীর্ঘ দিন স্বামী-স্ত্রী আলাদা থাকার ফলে সম্পর্কে ফাটল ধরে। এটা খুবই মামুলি কথা যে, মানুষ দাম্পত্য জীবন শুরু করে আলাদা থাকার জন্য নয়। বরং একসাথে থাকার জন্য। আলাদা থাকলে যে সব সমস্যা হয় তা প্রনিধাণযোগ্য। এর ফলে কখনো কখনো পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। যার ভূরি ভূরি প্রমাণ পত্রিকার পাতায় অহরহ চোখে পড়ে। দাম্পত্য কলহের কারণগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। যাই হোক মহান আল্লাহ্ এ দিকে ইঙ্গিত করে পৃথিবীর প্রথম দম্পতিকে বলেছেন, "হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা ইচ্ছে স্বচ্ছন্দে আহার কর।"[২৫]

শান্তির নীড় হিসেবে গড়া

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ববোধ এবং আন্তরিকতার ফলে দাম্পত্য জীবন তথা সংসার একটি সুখের ঠিকানায় পরিণত হয়। আর এতে স্বামী-স্ত্রী কারো অবদান কম নয়। তবে এ ক্ষেত্রে স্ত্রীদের দায়িত্ব অধিক। স্ত্রীকে সংসার এবং পরিবারে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে স্বামী সেখানে আসার জন্য এবং অবস্থান করার জন্য ব্যাকুল থাকে। স্বামী মনে করবে, এটি তার সবচেয়ে আরাম ও নিরাপদ স্থান। মহান আল্লাহ্ এ প্রেক্ষিতে বলেছেন, "আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সংগিনীদের যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।"[২৬] অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, এমন যাতে না হয় যে, সবচেয়ে অশান্তির জায়গা এটি এবং এখানে না আসলেই পরিত্রাণ।

আল্লাহর কাছে দুআ করা

দাম্পত্য জীবনে সুখ-সমৃদ্ধির জন্য মহান আল্লাহর দয়া একান্ত প্রয়োজন। এ জন্য সুযোগ এলেই আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হবে। মহান আল্লাহ ভাল মানুষের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, "এবং যারা প্রার্থনা করে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যারা হবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং

আমাদের কর মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য।"[২৭] অনেকে ঠিকই দু'আ করে এবং আল্লাহর শরণাপন্ন হয় যখন আর কলহের মাত্রা নাগালের মধ্যে থাকে না। অতএব সময়ের কাজ সময় থাকতেই করতে হবে।

সুদৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি করা

বিয়ের মাধ্যমে যে বন্ধন শুরু হলো তাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে তুলতে হবে। যাতে বিশৃংখলা ও অশান্তি কোনভাবে অনুপ্রবেশ করতে না পারে।

পরিপূরক মনে করা

আল-কুর'আনের চেতনা অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, পরস্পরের পরিপূরক। কোন একজনের আন্তরিকতা দাম্পত্য জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ করতে পারে না। বরং দু'জনের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাই পারে এ বন্ধনকে সুদৃঢ় ও মজবুত করতে।

ত্যাগের মানসিকতা

দাম্পত্য সুখ-শান্তি অনেকটা নির্ভর করে ত্যাগের মানসিকতার ওপর। এককে জনের সামান্য ত্যাগ সংসারকে ভয়াবহ অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারে। এ জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই ত্যাগ স্বীকারের মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই দাম্পত্য জীবন শুরু করতে হবে।

পুত-পবিত্র জীবন যাপন

আজকাল অধিকাংশ সমস্যা ও ঝামেলা দেখা দেয় এর অভাবে। বিবাহ-বহির্ভূত অবৈধ সম্পর্কের কারণে প্রথমে অবিশ্বাস ও পরে ঝগড়া-বিবাদের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থায়ী কলহের দিকে টার্ন নেয়। এ জন্য পুত-পবিত্র জীবনের কোন বিকল্প নেই।

পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয়া

সংসারে সকল কাজে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিলে অনেকাংশ বিরোধ মিটে যায়। তখন ভুল কিছু হলেও কেউ কাউকে দোষারোপ করার সুযোগ থাকে না। মহান আল্লাহ্ এ দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন, "সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সঙ্গতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে।"[২৮]

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও টিপটপ থাকা

স্বামী-স্ত্রীর কিছু কিছু ছোট খাট বদ অভ্যাস ধীরে ধীরে পারস্পরিক ঘৃণার সৃষ্টি করে, যা কলহের পুঁতিগন্ধময় দুয়ার খুলে দেয়। যেমন নিয়মিত দাঁত ব্রাশ না করা, নিয়মিত গোসল না করা, কাপড়-চোপড় অপরিস্কার রাখা ইত্যাদি।

হাসি-তামাশা করা

সংসার কোন সরকারি দপ্তর নয়। এখানে স্বাভাবিক হাসি-তামাশা করা যেতে পারে। এখানে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সামান্য অভিমান থাকাও দূষণীয় নয়।

উপঢৌকন বিনিময়

জীবনকে রুটিন বানিয়ে ফেলা উচিৎ নয়। জীবনে বৈচিত্র্য আনা প্রয়োজন। নচেৎ একঘেঁয়েমি আসে। পরিণতিতে কলহ দেখা দেয়। এ জন্য মাঝে মাঝে স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে উপহার-উপঢৌকন প্রদান করা উচিৎ।

আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভাল ব্যবহার

স্বামীর দিকের আত্মীয় আসলে স্ত্রীর বেশি আগ্রহ দেখানো উচিৎ। আবার স্ত্রীর দিকের আত্মীয় আসলে স্বামীকে বেশি তৎপর হওয়া উচিৎ। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে কলহ বাসা বাধতে পারে না।

তাছাড়া নিম্নোক্ত অভ্যাসগুলো প্রতিপালনের মাধ্যমে সংসারে সুখ ও সমৃদ্ধি নেমে আসে। যেমন– সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেওয়া, পরিপোষক মনে করা, খোঁজ-খবর রাখা, লজ্জা, আত্মসমালোচনা ও আত্মবিচার, সততা, ঐক্য, শৃঙ্খলা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সমঝোতা, সমন্বয়, হৃদ্যতা, দয়া-মায়া, ভালবাসা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, কল্যাণ কামনা, নিষ্ঠা, সরলতা, ইহসান প্রদর্শন, সাহায্য-সহযোগিতা, ক্ষমা, দায়িত্বানুভূতি, অল্পতুষ্টি, কৃতজ্ঞতা, নিজেদের সমস্যা যথাসম্ভব নিজেরাই নিষ্পত্তি করা, কুপ্রবৃত্তির দমন ও সুপ্রবৃত্তির লালন, পারস্পরিক ভালবাসা ও কাজের মূল্যায়ন।

স্বামীর বিশেষ কর্তব্য

সুখী দাম্পত্য জীবনের স্বার্থে স্বামীকে বিশেষ কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়। যেমন–

দেনমোহর প্রদান করা

দেনমোহরের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলার বিধান মত স্ত্রীকে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং চুক্তিমত পুরোপুরি দেনমোহর স্ত্রীর প্রাপ্য। এই প্রাপ্য প্রসন্নচিত্তে আদায় করতে হয়। দেনমোহর নিয়ে ছল-চাতুরির আশ্রয় নেওয়ার কোন সুযোগ ইসলাম রাখেনি। যে দেনমোহর পরিশোধ করতে সক্ষম নয়; তার জন্য বিয়ে নয়, বিয়ে সক্ষম পুরুষের জন্য। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মাহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে।"[২৯]

সদ্ব্যবহার করা

স্ত্রীর সাথে সৌজন্যমূলক ও মধুর ব্যবহার করা স্বামীর কর্তব্য। নচেৎ এক সময় কলহ দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর।"[৩০] অতএব ভাল ব্যবহার দাম্পত্য জীবনকে সুন্দর ও সুখময় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। উত্তম ব্যবহার মানুষের মধ্যকার সকল বিরোধকে হ্রাস করে দেয়। মহানবী স. এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে তার পরিবার-পরিজনের কাছে উত্তম। আমি আমার পরিবারের কাছে উত্তম।"[৩১] অতএব ঘরে স্ত্রীর সাথে অসদাচরণ করে কেউ ভাল মানুষ হতে পারে না। রসূলুল্লাহ্ স. আরো বলেছেন, "তোমরা আমার কাছ থেকে মেয়েদের সাথে সদ্ব্যবহার করার শিক্ষা গ্রহণ কর। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টা সর্বাপেক্ষা বাঁকা। অতএব তুমি যদি তা সোজা করতে যাও তবে ভেংগে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে এবং যদি ফেলে রাখ তবে বাঁকা হতেই থাকবে। অতএব তোমরা নারীদের সাথে ভালো ব্যবহার কর।"[৩২] আসলে মেয়েদের সাথে খুব সতর্কতার সাথে চরম ও নরমের মধ্যে ভারসাম্য রেখে আচরণ করতে হয় নচেৎ হিতের বিপরীত হয়ে যেতে পারে।

শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন না করা

কোন কোন স্বামী নিজেকে প্রভু আর স্ত্রীকে ভৃত্য মনে করে। আবার কেউ কেউ নিজেকে রাজা আর স্ত্রীকে প্রজা ভাবার ফলে তাদের প্রতি খারাপ আচরণ করে থাকে। কারো কারো চিন্তা-চেতনা এর চেয়েও কুৎসিত। যার পরিপ্রেক্ষিতে সংসারে কলহ দেখা দেয় এবং সংসারে ভাংগনের সুর বেজে ওঠে। মহানবী স. এসব ব্যাপারে মানুষকে সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তুমি স্ত্রীর চেহারায় আঘাত করবে না, গালমন্দ করবে না এবং ঘর থেকে বের করে দিবে না।"[৩৩] রসূলুল্লাহ্ স. আরো বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর বাঁদীদেরকে (স্ত্রীলোকদের) মারপিট করো না।"[৩৪]

যৌতুক দাবি না করা

যৌতুক প্রথা যে কোন সমাজের জন্য অভিশাপ। যৌতুক জাহিলী চিন্তা-চেতনার পরিচায়ক। আমাদের দেশে যৌতুকের বলি হচ্ছে অসংখ্য নারী। যৌতুকের অভিশাপে অনেক নারী লাঞ্ছিত হচ্ছে, ঘর ভেঙ্গে যাচ্ছে, আত্মহত্যা ও হত্যা সংঘটিত হচ্ছে। যৌতুকের দাবি মেটাতে পারছে না বলে অনেক বাবা-মা তাদের বিবাহযোগ্য কন্যাকে বিয়ে পর্যন্ত দিতে পারছে না। ইসলামের দৃষ্টিতে যৌতুক নিকৃষ্টতর একটি ব্যাপার। যৌতুকের মত কোন নিবর্তনমূলক প্রথা ইসলাম বৈধ রাখেনি। রাসূলুল্লাহ্ স.

বিভিন্ন বাণীর মাধ্যমে এ কাজটির প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন, "যৌতুক সর্বনিকৃষ্ট উপার্জন।"[৩৫] তিনি আরো বলেছেন, "অন্যায় যৌতুক সর্বনিকৃষ্ট অপবিত্র।"[৩৬]

গোপনীয়তা রক্ষা করা

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক। একের কাছে অন্যের কিছুই গোপন থাকে না। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের গোপন বিষয়সমূহ অন্যের কাছে প্রকাশ করা যাবে না। এই নিকৃষ্ট কর্ম যারা করে তারা কিয়ামত দিবসে সবচেয়ে মন্দ মানুষ হিসেবে বিবেচিত হবে। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে নিকৃষ্ট যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট গমন করে এবং সেও (স্ত্রী) তার স্বামীর নিকট গমন করে। তারপর স্বামী তার স্ত্রীর গোপন বিষয়াদি (অন্যের কাছে) প্রকাশ করে।"[৩৭]

ইনসাফ করা

কারো একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে কোন রকম পক্ষপাতিত্ব না করে পূর্ণ ইনসাফ করা প্রয়োজন। আর এটি না পারলে তার জন্য একাধিক বিয়ে নয়। তাহলে বলা যায়, স্বামী এবং দ্বিতীয় স্ত্রী ইচ্ছে করেই কলহের দরজা খুলে দিল। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ সাবধান করে বলেন, "আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে বিয়ে করবে।"[৩৮] একান্ত যদি কেউ একাধিক বিয়ে করেই ফেলে তার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ পদ্ধতি বলে দিয়েছেন, "আর তোমরা যতই ইচ্ছে কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে কখনোই পারবে না, তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রেখো না।"[৩৯]

খোরপোষ দেয়া

কোন কোন স্বামী তার স্ত্রী এবং সন্তানকে খরচ দেওয়ার ব্যাপারে উদাসীন। যার ফলে সংসারে নেমে আসে দাম্পত্য কলহ। অতএব স্ত্রীকে সমমানের খাদ্য ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক সুবিধা দিতে হবে। এ ব্যাপারে কোন রকমের বৈষম্য করা যাবে না। মহানবী স. বলেছেন, "তোমরা যখন খাবে তখন তাদেরকেও খাওয়াবে। আর তোমরা যখন পরিধান করবে তখন তাদেরকেও পরিধান করাবে।"[৪০]

বাসস্থানের ব্যবস্থা করা

স্ত্রীর খাওয়া পরার পাশাপাশি তার বাসস্থানের ব্যবস্থা করাও একান্তভাবে স্বামীর কর্তব্য। এ ব্যাপারে কোন ধরনের বিতর্কের সুযোগ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ ঘরে বাস কর তাদেরকেও সেরূপ ঘরে বাস করতে দিবে।"[৪১]

সদুপদেশ দান করা

মানুষের মন-মেজাজ সব সময় এক রকম থাকে না। আবার অনেক সময় মানুষও ভুল করতে পারে। স্ত্রীও একজন মানুষ হিসেবে মানবীয় দোষ-গুণ থেকে সেও মুক্ত নয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশংকা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও।"[৪২]

ভাল মানুষ হওয়া

সংসারে সুখ ও সমৃদ্ধির স্বার্থে স্বামীকে ভাল মানুষ হতে হবে। বিশেষত তার স্ত্রীর কাছে তাকে উত্তম মানুষ হিসেবে প্রমাণ পেশ করতে হবে। আসলে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ তারাই যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে ভাল। কারণ একজন পুরুষকে তার স্ত্রী যত কাছ থেকে জানে অন্য কেউ সে ভাবে জানে না। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।"[৪৩]

দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করা

দোষে গুণে মানুষ। স্ত্রীও মানুষ। তার কোন দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা ক্ষমা করে দিতে হবে। এ ক্ষমার মাধ্যমে স্ত্রীর কাছে স্বামীর উদারতা প্রকাশিত হয়। এতে কলহের সম্ভাবনা দূরিভূত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন, "তার কোন আচরণে অসন্তুষ্ট হলে, অন্য গুণের কথা স্মরণ করে সন্তুষ্ট হবে।"[৪৪]

উত্যক্ত না করা

উত্যক্ত ব্যাপারটি এমন যে, তা সাধারণত পুরুষ কর্তৃক নারীকে করা হয়ে থাকে। এতে সমাজে অনেক বিপত্তি দেখা দেয়। অনেক সময় অযাচিত উত্যক্ত ও উপদ্রবের ফলেও বিরোধ পরিদৃষ্ট হয়। এ জন্য স্ত্রীকে বিরক্ত করা যাবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "তাদেরকে সঙ্কটে ফেলার জন্য উত্যক্ত করবে না।"[৪৫]

সম্পদে হস্তক্ষেপ না করা

স্ত্রীর সম্পদে হস্তক্ষেপ না করা স্বামীর অন্যতম কর্তব্য। ইসলামে ন্যায় সঙ্গত ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত। নারীদেরও আয় উপার্জন ও সম্পদের মালিক হওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে, যেমন অধিকার আছে পুরুষের। ইসলাম যেমন নারীকে ব্যক্তি স্বাধীনতা দিয়েছে, তেমনি অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ।[৪৬] কাজেই স্ত্রীর অর্জিত সম্পদে স্বামী ভাগ বসাবে না"।

স্ত্রীর বিশেষ কর্তব্য

পারিবারিক জীবনের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য স্বামীকে যেমন কতকগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়, তেমনি স্ত্রীকেও কতকগুলো কর্তব্য পালন করতে হয়। স্ত্রীর বিশেষ কর্তব্য নিম্নরূপ ঃ

স্বামীর বৈধ আদেশ মেনে চলা

পরিবারটি স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে উভয়েরই অবদান মূল্যবান। তবে পরিবারে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে একজনের নেতৃত্ব মেনে চলা প্রয়োজন। নারীদের তুলনায় দৈহিক ও প্রকৃতিগত ভাবে পুরুষ অধিক শক্তিধর ও সক্ষম। সুতরাং পুরুষকেই যুক্তিসঙ্গতভাবে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাদের একেকে অপরের উপর বিশিষ্টতা দান করেছেন এবং এ জন্য যে, পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে।"[৪৭] বাংলাদেশে পারিবার প্রথা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক ভাল অবস্থানে রয়েছে। তবে এ অবস্থা পূর্বে আরো ভাল ছিল।

তত্ত্বাবধান

স্ত্রীকে স্বামী, সন্তান সবার জন্য কাজ করতে হয়। স্বামীর সেবা করতে হয়, সন্তানদের পরিচর্যা করতে হয়। সংসারের যাবতীয় কাজ কর্মের দায়িত্বই থাকে স্ত্রীর ওপর। নবী দুলালী ফাতিমা রা. নিজ হাতে সংসারের যাবতীয় কাজ করতেন। জাঁতায় গম পিষতে পিষতে তাঁর হাতে ফোঁসকা পড়ে যেত। স্ত্রীর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন, "স্ত্রী স্বামীর পরিজনবর্গ ও সন্তানদের তত্ত্বাবধানকারিণী। তাকে এই দায়িত্ব সম্বন্ধে জবাবদিহি করতে হবে।"[৪৮]

সতীত্ব রক্ষা করা

নিজের সতীত্ব রক্ষা করা স্ত্রীর পবিত্র দায়িত্ব। সতী সাধ্বী ও উত্তম চরিত্রের রমণীদের পরিচয় দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগতা এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ যা হিফাযত করার নির্দেশ দিয়েছেন, তারা তা হিফাযত করে।"[৪৯] এ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন, "যদি সে (স্বামী) তার (স্ত্রী) থেকে অনুপস্থিত থাকে, তবে সে আন্তরিকতার সাথে তার আত্মাকে হিফাযত করে।"[৫০]

স্বামীর আহ্বানে সাড়া দেয়া

স্বামীর সকল বৈধ কাজের ডাকে সাড়া দেওয়া স্ত্রীর কর্তব্য। হাদীসে বর্ণিত আছে, "যখন স্বামী নিজ স্ত্রীকে নিজ প্রয়োজনে আহ্বান করে, তখন তার ডাকে সাড়া দেওয়া স্ত্রীর কর্তব্য। যদিও সে তন্দুর পাকানোর কাজে ব্যস্ত থাকে।"[৫১] অনেক সময় স্ত্রীর

একগুঁয়েমির কারণে স্বামী বিপথগামী হয়। রসূলুল্লাহ্ স. আরো বলেছেন, "যখন কোন লোক তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে কিন্তু সে আসে না, ফলে স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত কাটায়, ফেরেশতাগণ তাকে সকাল হওয়া পর্যন্ত অভিশাপ দিতে থাকে।"[৫২] এ সবই প্রযোজ্য হবে তখন যখন স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

পর্দা করা

পর্দা করা এবং শালীনতা রক্ষা করে চলা সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলাদের বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে বাইরে যেতে হলে আবরু 'ইযযত রক্ষা করে চলা উচিত। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু'মিনদের নারীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।"[৫৩]

শালীনতা রক্ষা করে চলা

মহিলাদের অশালীন পোশাক পরে বাইরে ঘোরাফেরা করা উচিত নয়। এতে পুরুষের পশুবৃত্তি জাগ্রত হয় এবং নানা ধরনের অঘটন ঘটে।

পর-পুরুষের সাথে মোলায়েম স্বরে কথা না বলা

অনেক সময় নারীদের বানোয়াট মিষ্টি কথা-বার্তায় চরিত্রহীন পুরুষেরা প্রলুব্ধ হয়, আকৃষ্ট হয়। তারা কুমতলব হাসিলের বাহানা খোঁজে। বিশেষ করে স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে এমনটি বেশি হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ সাবধান করে বলেন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পর-পুরুষের সাথে কৃত্রিম মোলায়েম স্বরে এমন ভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে।"[৫৪]

স্বামীর গোপন বিষয়াদি প্রকাশ না করা

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক থাকাটাই স্বাভাবিক, দু'জনের মধ্যে কোন কিছু গোপন থাকে না। কিন্তু স্ত্রীর গোপন বিষয় যেমন স্বামীর জন্য অন্য কারো কাছে প্রকাশ করা কোন মতেই বৈধ নয়, ঠিক তেমনি স্ত্রীও স্বামীর কোন গোপন কথা বা গোপন বিষয় অন্যের কাছে প্রকাশ করবে না। একে অপরের গোপনীয়তা রক্ষা করা পবিত্র আমানত। গোপনীয়তা ফাঁস করলে পরবর্তীতে তা জানাজানি হয়ে গেলে দাম্পত্য জীবনে মহাবিপর্যয় নেমে আসে।

স্বামীর প্রতি ইহসান করা

মুসলিম পরিবারে স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের সুখ-দুঃখের অকৃত্রিম সঙ্গী। দুঃখ-কষ্ট ভাগাভাগি করে নিলে বহন করা সহজ হয়। কোন রকম দৈব দুর্বিপাকে স্বামীর দৈহিক

বা আর্থিক সামর্থ্যের হানি ঘটলে, স্ত্রী ধৈর্য ধারণ করবে। পূর্বের অবদান ও ভালবাসার কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞ থাকবে। অক্ষম স্বামীকে দেনমোহরের ঋণ-ভার থেকে মুক্তি দেওয়া স্ত্রীর নৈতিক ও মানবিক কর্তব্য। মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, "স্ত্রীগণ সানন্দে স্বেচ্ছায় মাহরের কিছু অংশ দান করে দিলে, তোমরা তা সন্তুষ্ট চিত্তে খেতে পার।"[৫৫]

বিনানুমতিতে অর্থ ব্যয় না করা

স্বামী হলো পরিবারের কর্তা বা নেতা। নেতার অনুমতি ছাড়া কোন কাজ করলে পরিবারে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। স্বামীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া স্ত্রী স্বামীর অর্থ যথেচ্ছভাবে ব্যয় করবে না। হ্যাঁ, যদি বিশেষ প্রয়োজন হয়, তবে স্বামীরও এ ব্যাপারে কোন আপত্তি করা উচিত নয়। যথেচ্ছ ব্যয় নিষেধ করে মহানবী স. বলেন, "স্ত্রী স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার গৃহ থেকে কিছু ব্যয় করবে না।"[৫৬] তবে স্ত্রী তার নিজের অর্থ স্বাধীনভাবে ব্যয় করতে পারবে।

স্বামীর গৃহ ত্যাগ না করা

পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতের অমিল হতে পারে; রাগ-বিরাগ হতে পারে। কিন্তু কোন অবস্থায়ই স্বামী যেমন স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দিতে পারবে না, স্ত্রীও তেমনি স্বামীর ঘর থেকে বের হয়ে যেতে পারবে না। কারণ ঘর থেকে বের হয়ে গেলে, স্বামী-স্ত্রীর নিজস্ব ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষও জড়িত হয়ে পড়ে। এতে নানা রকম জটিলতা দেখা দিতে পারে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আরো খারাপ হতে পারে। এ ধরনের স্ত্রী লোকের ওপর আল্লাহর রহমত থাকে না।

দাম্পত্য জীবনে বর্জনীয় বিষয়সমূহ

যেসব কারণে দাম্পত্যজীবনে কলহ ও বিরোধ দেখা দেয় সেগুলোর ব্যাপারে সতর্ক হওয়াও কলহ নিষ্পত্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

বল্গাহীনতা

ইসলাম প্রত্যেকটি ব্যাপারে সীমারেখা টেনে দিয়েছে। এ সীমারেখা অতিক্রম করলে বিপত্তি দেখা দেয়। অতএব বিয়ের পর বল্গাহীন চিন্তা ও জীবনের কোন সুযোগ নেই। তখন জীবন একটি শৃঙ্খলার মধ্যে বেধে ফেলতে হবে।

অশ্লীলতা

বাংলাদেশে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গ্রামের চেয়ে শহরে এবং গরীবের চেয়ে ধনীদের মধ্যে অশ্লীলতার মাত্রা তুলনামূলক বেশি। যার ফলে দাম্পত্য জীবনে বিরোধও বেশি পরিলক্ষিত হয় ধনী এবং শহুরে লোকের মধ্যে তুলনামূলক বেশি।

পরিশেষে শুরু হয় অবিশ্বাস ও অসন্তোষ এবং ভাংগন শুরু হয় সংসারে। এর একটিই কারণ তাহলো নিয়ন্ত্রণহীন জীবন যাপন। সর্বোপরি অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা দাম্পত্য জীবনে বিরোধের পথ খুলে দেয়। এ জন্য ইসলাম এটিকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক অশ্লীল কাজের নিকটেও যেও না।"[৫৭]

অনুমাননির্ভর কথা ও সিদ্ধান্ত

দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে জানা-অজানা নানা নিষয় নিয়ে মতদ্বৈতার সৃষ্টি হয়। এর একটি হলো বেশি অনুমান। স্বামী তার স্ত্রীর ব্যাপারে এবং স্ত্রী তার স্বামীর ব্যাপারে ধারণা করে অনেক সময় বসে থাকে, যা অনেক সময় অবাস্তব প্রমাণিত হয়। এতে অনেক সময় কলহ দেখা দেয়। এ জন্য নিয়ম হলো নিশ্চিত না হয়ে কারো ব্যাপারে আন্দাজ অনুমাননির্ভর কথা না বলা। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ।"[৫৮]

সন্তানের ব্যাপারে গুরুত্ব কম দেয়া

অনেক সময় সন্তানরা বিপথগামী হলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়। আজকাল সন্তানরা মাদকাসক্ত হচ্ছে, বাজে লোকদের সাথে আড্ডা দিচ্ছে তাছাড়া আরো নাম না জানা অনেক অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে । এসবের জন্য সন্তানের বাবা-মার দায়িত্বহীনতা অনেকাংশে দায়ী। অধিকাংশ বাবা-মা তাদের সন্তানের ব্যাপারে উদাসীন। এই সুযোগে সন্তানরা অপরাধে জড়িয়ে পরে। পরবর্তীতে স্বামী-স্ত্রী এর জন্য পরস্পরকে দায়ী করে। ফলশ্রুতিতে গৃহবিবাদ শুরু হয়। সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে আল-কুর'আনের প্রতিচ্ছবি রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে স্নেহ কর এবং তাদের আচার-আচরণকে সুন্দর কর।"[৫৯]
তাছাড়া সৌহার্দ্যপূর্ণ দাম্পত্য জীবনের স্বার্থে নিম্নোক্ত বৈশিষ্টাবলি থেকে দূরে থাকতে হবেঃ তাহলো মিথ্যা, গর্ব-অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা, কপটতা, গালা-গালি, ঝগড়া-বিবাদ, লোভ-লালসা, দায়িত্বহীনতা, অবাধ মেলামেশা (অন্য পুরুষের সাথে), উচ্ছৃঙ্খলতা, সীমালংঘন, অপরিণামদর্শিতা, অধিকার হরণ, পশুবৃত্তি, একগুঁয়েমি, অপরিচ্ছন্নতা, নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা, পাশবিকতা, বস্তুবাদিতা, উপহাস, অপবাদ, গীবত ও চোগলখুরি, অহেতুক সন্দেহ, প্রদর্শনেচ্ছা, তিরস্কার ইত্যাদি।

বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়

উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি নজর দিলে কলহ ও বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাহলে আর নিষ্পত্তি করার জন্য কারো দ্বারস্থ হতে হবে না। তারপরও কলহ

দেখা দিলে কি করতে হবে তা ইসলাম বাতলে দিয়েছে। নিষ্পত্তিরও ইসলাম কিছু ধারাবাহিক ও পর্যায়ক্রমিক পন্থা বলে দিয়েছে। যেমন–

ধৈর্য ধারণ করা

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক উন্নত রাখার বড় একটি মাধ্যম ধৈর্য। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যখনই কোন প্রকার ঝগড়া-বিবাদ বা মনোমালিন্য দেখা দিবে, তখনই তাদের উভয়ের জন্যে এ নসীহত রয়েছে যে, প্রত্যেকেই যেন অপরের ব্যাপারে নিজের মধ্যে সহ্য শক্তির সুরক্ষা করে, অপরের কোন কিছু অপছন্দনীয় হলে বা ঘৃণার্হ হলেও সে যেন দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য রক্ষার উদ্দেশ্যে তা অকপটে বরদাশ্‌ত করতে চেষ্টা করে। কেননা এ কথা সর্বজনবিদিত যে, পুরুষ ও স্ত্রী স্বভাব-প্রকৃতি, মন-মেজাজ ও আলাপ ব্যবহার ইত্যাদির দিক দিয়ে পুরোমাত্রায় সমান হতে পারে না। এটা সৃষ্টি রহস্যও বটে। কাজেই অপরের অসহনীয় ব্যাপার সহ্য করে নেয়ার জন্যে নিজের মধ্যে যোগ্যতা অর্জন করা কর্তব্য। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর দুর্ব্যবহারে ধৈর্য ধারণ করবে, সে আইয়ুব আ.-এর ন্যায় পুরস্কৃত হবে। আর যে স্ত্রী স্বামীর দুর্ব্যবহারে ধৈর্য ধারণ করবে, সে ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুযাহিমের ন্যায় পুরস্কৃত হবে।"[৬০] নিম্নের ঘটনা দাম্পত্য জীবনে ধৈর্যের অপরিহার্যতাকে তুলে ধরেছে।

এক হাদীসে আছে যে, এক ব্যক্তি উমর রা.-এর নিকট নিজের স্ত্রীর দুর্ব্যবহারের অভিযোগ পেশ করার জন্য উপস্থিত হলো। সে উমরের বাড়ীর ফটকে দাঁড়িয়ে তাঁর বাইরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। এই সময় শুনতে পেল, উমরের স্ত্রী তাঁকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করছেন। কিন্তু উমর রা. তার কোন জবাব না দিয়ে নীরবে সহ্য করছেন। এটা শোনার পর লোকটি ফিরে যেতে উদ্যত হলো। সে ভাবলো, এমন দোর্দণ্ড ও প্রতাপান্বিত খলিফার যখন এই অবস্থা, তখন আমি আর কোথাকার কে? ঠিক এই সময় উমর রা. বাইরে বেরিয়ে দেখলেন, লোকটি চলে যাচ্ছে। তিনি ডেকে বললেন, তুমি কেন এসেছিলে আর কেনই বা দেখা না করে চলে যাচ্ছ? সে বললো, আমীরুল মুমিনীন! আমার সাথে আমার স্ত্রী যে দুর্ব্যবহার করে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য আমি আপনার কাছে এসেছিলাম। কিন্তু শুনতে পেলাম স্বয়ং আপনার স্ত্রীও তদ্রূপ। তাই ফিরে যাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম যে, আমীরুল মুমিনীনের অবস্থা যখন এরূপ, তখন আমি আর কোথাকার কে? উমর রা. বললেনঃ শোন ভাই! আমার ওপর তার কিছু অধিকার আছে বলেই আমি তাকে সহ্য করলাম। দেখ, সে আমার খাবার রান্না করে, রুটি বানায়, কাপড় ধোয় এবং আমার সন্তানদের দুধ খাওয়ায়। অথচ এসব কাজ তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তবে এসব কাজ করে দিয়ে সে আমার মনকে হারাম উপার্জন থেকে ফিরিয়ে রাখে। এ জন্যই আমি তাকে সহ্য করি। লোকটি বললো, আমীরুল মুমিনীন! আমার স্ত্রীও তদ্রূপ। উমর রা. বললেন, "তাহলে তাকে সহ্য করতে থাক। ভাই! দুনিয়ার জীবনটা তো নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী।"[৬১] এ

ঘটনা ও কথা-বার্তায় দম্পতিদের জন্য অনেক উপাদান রয়েছে। আর এসব উপাদান জীবনে ধারণ করলে অশান্তি দূর করা অনেকটাই সম্ভব হবে।

তালাককে সর্বনিকৃষ্ট ঘোষণা

দাম্পত্য সম্পর্ক কোন অস্থায়ী ও ঠুনকো বিষয় নয়। এটি স্থায়ী ও মধুর সম্পর্ক। অতএব কখনো এমন পরিস্থিতির দিকে যাওয়া যাবে না যাতে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। যার পরিপ্রেক্ষিতে এক সময় তালাকের মত অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্ম হয়। হালাল কাজের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট কাজ হলো তালাক। দাম্পত্য জীবনে যাতে বিরোধ ও কলহ সৃষ্টি না হয় সে জন্য ইসলাম বিচ্ছেদের ব্যাপারটিকে সর্বনিকৃষ্ট বলে ঘোষণা করেছে। মহানবী স. বলেছেন, "মহান আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে (নিকৃষ্ট) ঘৃণিত হালাল কাজ হলো তালাক।"[৬২]

উপদেশ দেয়া, বিছানা পৃথক করে দেয়া এবং অন্যস্থানে চলে যাওয়া

একটি পর্যায়ে গিয়ে কিছু দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হয়। তবে সে অবস্থা সৃষ্টি হলেই কেবল এমন ব্যবস্থা নিতে হবে। আর তা হলো স্ত্রীর অবাধ্যতা। আর ব্যবস্থাগুলো পর্যাক্রমিকভাবে নিতে হবে। উপদেশে কাজ হয়ে গেলে বিছানা পৃথক করার দরকার নেই। যদি উপদেশে কাজ না হয় তখন বিছানা আলাদা করে দিতে হবে। যদি এতেও কাজ না হয় তাহলে অন্যস্থানে সাময়িকভাবে চলে যেতে হবে। এটাই রাসূলুল্লাহ্ স. করেছিলেন। তিনি মারধোর করেননি।

সালিস নিয়োগ করা

দাম্পত্য জীবন সংরক্ষণের উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহ যদি ব্যর্থ হয়ে যায়, বিরোধ বিরাগ ও মনোমালিন্যের মাত্রা যদি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতেই থাকে, তাহলে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত মীমাংসার জন্যে উভয়ের নিকটাত্মীয়দের সাগ্রহে এগিয়ে আসা কর্তব্য। স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন এবং স্বামীর পক্ষ থেকে একজন পরস্পরের মধ্যে মিলমিশ বিধানের জন্যে ঐকান্তিক নিষ্ঠাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে চেষ্টা চালাবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে অথবা বিরোধের আশংকা দেখা দিলে উভয় পরিবার থেকে সমসংখ্যক সালিস নিয়োগ করতে হবে। যারা এদের মধ্যকার পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসার পথ বের করে দিবে। মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, "তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা করলে তোমরা স্বামীর পরিবার হতে একজন ও স্ত্রীর পরিবার হতে একজন সালিস নিযুক্ত করবে; তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন।"[৬৩] এ যেন পারিবারিক বিরোধ মীমাংসার আদালত এবং এ আদালতের বিচারপতি হচ্ছে এ দু'জন। তারা উভয়ের মনোমালিন্যের বিষয় ও তার

মূলীভূত কারণ সতর্কতার সঙ্গে অনুসন্ধান করবে। আর তার সংশোধন করে স্থায়ী মিলমিশ ও প্রেম ভালবাসা পুনর্বহালের জন্যে চেষ্টা করবে। বস্তুত স্বামী-স্ত্রী যদি বাস্তবিকই মিলে মিশে একত্র জীবন যাপনে ইচ্ছুক এবং সচেষ্ট হয় তাহলে সাময়িক ছোটখাট বিবাদ নিজেরাই মীমাংসা করে নিতে পারে। আর বড় কোন ব্যাপার হলেও তা এ পারিবারিক সালিসী আদালত দ্বারা মীমাংসা করিয়ে নেয়া খুবই সহজ। কুর'আন মাজীদের উপরোক্ত আয়াতে এ ব্যবস্থারই নির্দেশ করা হয়েছে।

'যদি তোমরা...ভয় করো' বলে আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে দেশের শাসক ও বিচারকদের, সমাজের মাতবর-সরদারদের কিংবা স্বামী-স্ত্রীর নিকটাত্মীয় ও মুরুব্বীদের।[৬৪] আল্লামা আবূ বকর আল-জাসসাস-এর 'আহকামুল কুরআন, খ. ২, পৃ. ২৩১-এ বলা হয়েছেঃ তোমাদের মনে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে যদি কোন ধরনের সন্দেহের উদ্রেক হয়, সম্পর্ক মধুর নেই বলে ধারণা জন্মে, তাহলে তখন প্রকৃত ব্যাপার তদন্ত করা এবং অবস্থার সংশোধনের জন্যে চেষ্টিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হলে দাম্পত্য জীবনে ভাঙ্গন আসতে পারে এবং তা কিছুতেই কারো কাম্য হতে পারে না– ইসলামও তা পছন্দ করে না আর এ চেষ্টার পদ্ধতি হিসেবে বলা হয়েছে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পক্ষ থেকে আলাদা আলাদা এমন দু'জন ব্যক্তিকে মাধ্যম ও সালিস হিসেবে নিযুক্ত করতে হবে, যারা কোন কথা বলে উভয়কে মানাতে পারবে। এ দু'জনকে এদের নিকটাত্মীয়দের মধ্য থেকেই হতে হবে। এ প্রসঙ্গে তাফসীরে বায়যাবী প্রণেতা বলেন,[৬৫] 'কেননা নিকটাত্মীয়রাই প্রকৃত অবস্থার গভীরতর রূপের সন্ধান পেতে পারে, সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারে এবং তারা অবশ্যই উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক জুড়ে দেয়ার জন্যে সর্বাধিক আগ্রহী হয়ে থাকে।

বাইরের লোক এ মীমাংসা কাজে নিয়োগ না করে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই আপনজন নিয়োগের নির্দেশ দেয়ার কারণ যে কি, তা আল্লামা আবূ বকর আল-জাসসাস-এর নিম্নোক্ত অভিমত থেকে জানা যায়। তিনি এ কারণ দর্শাতে গিয়ে লিখেছেন–

'বাইরের অনাত্মীয় লোক বিচারে বসলে তাদের কোন এক পক্ষের দিকে ঝুঁকে পড়ার ধারণা হতে পারে; কিন্তু উভয়েরই আপন আত্মীয় যদি এ মীমাংসার ভার গ্রহণ করে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ পক্ষের কথা বলে, তাহলে এ ধরনের কোন ধারণার অবকাশ থাকে না- এজন্যেই আত্মীয় ও আপন লোককে এ বিরোধ মীমাংসার ভার দিতে বলা হয়েছে।[৬৬]

আলী রা.-এর নিকট এক দম্পতি বহু সংখ্যক লোক সমভিব্যবহারে উপস্থিত হলো। তিনি তাদের আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তারা বললেন, এই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে

বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে; তার মীমাংসা চাই। তখন আলী রা. বললেন, উভয়ের আপন আত্মীয় থেকে এক-একজনকে এ বিরোধ মীমাংসায় নিযুক্ত করে দাও। যখন দু'জন লোককে নিযুক্ত করা হল, তখন আলী রা. বললেন, তোমাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা কতখানি তা জান? তারপরে তিনি নিজেই বলে দিলেন, 'তোমাদের দায়িত্ব হল, তারা দু'জনে মিলে মিশে একত্রে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকতে চাইলে তার ব্যবস্থা করে দেবে। আর যদি মনে কর যে, তারা উভয়েই বিচ্ছিন্ন হতে চায়, তাহলে পরস্পরকে শান্তিপূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেবে।'[৬৭]

বিচারকদ্বয় সব কথা শুনে, সব অবস্থা জেনে বুঝে একটি চূড়ান্ত ফয়সালা দেবে ও উভয়কে তা মেনে নেয়ার জন্যে বলবে। কিন্তু যদি তারা উভয় বা একজন তা মানতে রাযী না হয়, তাহলে তাকে ফয়সালা মেনে নেয়ার জন্যে নির্দেশ দিতে হবে। কেননা আয়াতে ব্যবহৃত শব্দনিচয়ের দৃষ্টিতে বলা যায়, এ দু'জন প্রথমত এক এক পক্ষ থেকে উকীল আর উকীলের কাজ হল শুধু বলা। কিন্তু সে বলায় যদি বিরোধের চূড়ান্ত অবসান না হয়, তাহলে তারা দু'জনে বিচারকর্তার মর্যাদা নিয়ে রায় মেনে নেয়ার জন্যে নির্দেশ দেবে। এ নির্দেশ মেনে নিতে উভয়েই বাধ্য। কেননা কুর'আন মাজীদে তাদের বলা হয়েছে 'হাকিম' হুকুমদাতা, বিচারক, ফয়সালাকারী।[৬৮]

এ ধরনের যাবতীয় চেষ্টা চালানোর পরও যদি মিলেমিশে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকবার কোন উপায় না বেরোয়, বরং উভয় পক্ষই চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্যে অনমনীয় হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ইসলাম তাদের দাম্পত্য জীবনের চূড়ান্ত অবসান ঘটাবার– তালাক দেয়ার অবকাশ দিয়েছে।

ইসলামে এ তালাকদানের একটা নিয়মও বেঁধে দেয়া হয়েছে এবং তা হচ্ছে এই যে, স্বামী তার স্ত্রীর 'তুহর' (হায়েয না থাকা) অবস্থায় একবার এক তালাক দেবে। এ তালাক লাভের পর স্ত্রী স্বামীর ঘরেই 'ইদ্দত পালন করবে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক রাখছে না– এরূপ তালাকদান ও 'ইদ্দত পালনের নিয়ম করার কারণ হল– এতে করে উভয়েরই স্নায়ু মণ্ডলির সুষ্ঠু এবং তাদের অধিক সুবিবেচক হয়ে ওঠার সুযোগ হবে। চূড়ান্ত বিচ্ছেদের যে কি মারাত্মক পরিণাম তা তারা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারবে। স্পষ্ট বুঝতে সক্ষম হবে যে, তালাকের পর তাদের সন্তান-সন্ততির ও ঘর-সংসারের কি মর্মান্তিক দুর্দশা হতে পারে। ফলে তারা উভয়েই অথবা যে পক্ষ তালাকের জন্যে অধিক পীড়াপীড়ি করেছে– ঝগড়া-বিবাদ ও বিরোধ-মনোমালিন্য সম্পূর্ণ পরিহার করে আবার নতুনভাবে মিলিত জীবন যাপন করতে রাযী হতে পারে। এ সাময়িক বিচ্ছেদ তাদের মধ্যে প্রেম-ভালবাসার তীব্র আকর্ষণও জাগিয়ে দিতে পারে।

যদি তাই হয়, তাহলে এক-এক তালাককে 'তালাকে রিজয়ী' বা 'ফিরিয়ে পাওয়ার অবকাশ পূর্ণ তালাক' বলা হবে। তিন মাস 'ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই উভয়ের পুনর্মিলন সাধন করতে হবে। এতে নতুন করে বিয়ে পড়াতে হবে না।

কিন্তু যদি এভাবে তালাক দেয়ার পর তিন মাসের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে গ্রহণ করা না হয়, তাহলে এ তালাক বায়েন তালাক হয়ে যাবে। তখন যদি ফিরিয়ে নিতে হয়, তাহলে পুনরায় বিয়ে পড়াতে হবে ও নতুন করে দেনমোহর ধার্য করতে হবে। এমতাবস্থায় স্ত্রী স্বাধীন– সে ইচ্ছা করলে প্রথম স্বামীকে পুনরায় গ্রহণ করতেও পারে, আর ইচ্ছা না হলে সে অপর কোন ব্যক্তিকে স্বামীত্বে বরণ করে নিতেও পারে। প্রথম স্বামী এ স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে কোনরূপ জবরদস্তি বা চাপ প্রয়োগ করতে পারবে না এবং তার অপর স্বামী গ্রহণের পথে বাধ সাধতেও পারবে না।

এক তালাকের পর 'ইদ্দতের মধ্যেই স্ত্রীকে যদি ফিরিয়ে নেয়া হয়, আর স্বামী-স্ত্রী হিসেবে জীবন যাপন শুরু করার পর আবার যদি বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে প্রথম বারের ন্যায় আবার পারিবারিক আদালতের সাহায্যে মীমাংসার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। এবারও যদি মীমাংসা না হয় তাহলে স্বামী তখন আর এক তালাক প্রয়োগ করবে। তখনও প্রথম তালাকের নিয়ম অনুযায়ীই কাজ হবে।

দ্বিতীয়বার তালাক দেয়ার পর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় আর তারপর বিরোধ দেখা দেয়, তখনো প্রথম দু'বারের ন্যায় মীমাংসার চেষ্টা করতে হবে। আর তা কার্যকর না হলে স্বামী তৃতীয়বার তালাক প্রয়োগ করতে পারে। আর এই হচ্ছে তার তালাকদানের ব্যাপারে চূড়ান্ত ও সর্বশেষ ক্ষমতা। অতঃপর স্ত্রী তার জন্যে হারাম এবং সেও তার স্ত্রীর জন্যে চিরদিনের জন্যে হারাম হয়ে যাবে। কুর'আন মাজীদে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে ঃ "এ তালাক দু'বার। অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রেখে দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে।"[৬৯]

এ 'মুক্ত করে দিবে' থেকেই তৃতীয় তালাক বোঝা গেল। তা মুখে স্পষ্ট উচ্চারণের দ্বারাই হোক, কি এমনি রেখে দিয়ে এক 'তুহর' কাল অতিবাহিত করিয়েই দেয়া হোক উভয়ের পরিণতি একই।

নবী করীম স.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ আয়াতে তো মাত্র দু'বার তালাকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাহলে তৃতীয় তালাক কোথায় গেল? তখন তিনি বললেন, 'সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে' বাক্যে-ই তৃতীয় তালাকের কথা নিহিত রয়েছে।[৭০]

উপসংহার

পরিশেষে দ্ব্যর্থহীনভাবে এ কথা বলা যায় যে, সুখী দাম্পত্য জীবন মহান আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের ঐকান্তিক চেষ্টায় এ সুখ আসতে পারে। এ

জন্য দু'জনকেই হতে হবে ধৈর্যশীল, আন্তরিক ও কল্যাণকামী। বাংলাদেশে দাম্পত্য কলহের একটি চিত্র ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে পাওয়া গেছে। এ তথ্য থেকে যে চিত্র পাওয়া যায়, তা সত্যি উদ্বেগজনক। এতে দেখা যায়, শুধু ঢাকা নগরীতে প্রতিদিন গড়ে ২৪.৪১ টি বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে। যা হিসাব করলে প্রতি মাসে ২৯৩ টিতে দাড়াচ্ছে। এটা শুধু ঢাকা নগরীর চিত্র। পুরো বাংলাদেশের অবস্থা এই চিত্রের উপর ভিত্তি করে অনুমান করা যায়। এখানে যে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে; আসল চিত্র তা নয়। কারণ সকল বিবাহ বিচ্ছেদের খবর সব সময় সিটি কর্পোরেশনে আসে না। অনেকে ব্যাপারটি ধামাচাপা দেয়। তাছাড়া সকল বিরোধ সব সময় বিচ্ছেদে রূপ নেয় না। অর্থাৎ বিরোধ এবং কলহের সংখ্যা প্রচুর। যাই হোক উপরোক্ত তথ্য ও চিত্র বাংলাদেশের মত একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশের জন্য হতাশাব্যঞ্জক। এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারে শুধু ইসলামী প্রদর্শিত বিধি-বিধান প্রতিপালন।

তথ্যনির্দেশ

১. مَآ انزَلنَا عَليكَ القُرانَ لِتَشقى আল-কুরআন, ২০:২
২. مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجعَلَ عَليكُم مِن حَرَجٍ আল-কুরআন, ৫:৬
৩. وَمَا جَعَلَ عَليكُم فِى الدِّين مِن حَرَجٍ আল-কুরআন, ২২:৭৮
৪. فَاقرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُران আল-কুরআন, ৭৩:২০
৫. وَلَقَد يَسَّرنَا القُرانَ لِلذِّكر فَهَل مِن مُدَّكِرٍ؟ আল-কুরআন, ৫৪:১৭, ২২, ৩২, ৪০
৬. لَايُكَلِّفُ اللهُ نَفسًا اِلّاوُسعَهَا আল-কুরআন, ২:২৮৬
৭. *Bangla Academy Bengali-English Dictionary*, Bangla Academy, Dhaka, 1994, p.299
৮. تنكح المرأة لاربع ، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ، فاظفر بذات الدين
বুখারী, ইমাম, *আসসহীহ,* অধ্যায় : আননিকাহ, অনুচ্ছেদ : আল আকফাউ ফিদ্দীন, আল-কুতুবুস সিত্তা, রিয়াদ : দারুস সালাম, খ্রি.২০০০, পৃ. ৪৪০
৯. لا تنكحوا النساء لحسنهنّ فلعله يُرديهنّ ، ولا لمالهنّ فلعله يطغيهنّ ، وانكحوهنّ للدين ، ولامة سوداء خرقاء ذات دين افضل রহীম, মওলানা মুহাম্মদ আবদুর, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন,* ঢাকা : খাইরুন প্রকাশনী, খ্রি. ১৯৮৩ পৃ. ১০৭
১০. ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرًا له من زوجة صالحة ইবনে মাজা, ইমাম, *আসসুনান,* অধ্যায়: আননিকাহ, অনুচ্ছেদ: আফদালুন নিসা, দেওবন্দ: আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, খ্রি.১৯৬৫

১১. انكحوا الصالحين والصالحات دারিমী, ইমাম, *আসসুনান,* অধ্যায় : আননিকাহ, অনুচ্ছেদ: ১, বৈরূত: দারু ইহইয়ায়িস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ, খ্রি. ১৮৭৬

১২. خير متاع الدنيا المراة الصالحة মুসলিম, ইমাম, *আসসহীহ,* অধ্যায়: আররিদা', অনুচ্ছেদ : খায়রু মাতীহদ দুন্য়া আল মারআতুস্ সালিহা দিল্লী: আল মাকতাবা রশীদিয়া, খ্রি. ১৯৫৬

১৩. ليس من متاع الدنيا شئ افضل من المراة الصالحة ইবনে মাজা, ইমাম, *আসসুনান,* অধ্যায়: আননিকাহ, অনুচ্ছেদ : আফদালুন নিসা, প্রাগুক্ত

১৪. من سعادة ابن آدم ثلاثة ، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة ، من سعادة ابن آدم : المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح ، ومن شقاوة ابن آدم : المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء সাবিক, আস্ সায়্যিদ, *ফিকহুসসুন্নাহ্,* বৈরূত : দারুল ফিকর, খ্রি. ১৯৮৩, খ.২, পৃ.৯

১৫. من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه ، فليتق الله فى الشطر الباقى , প্রাগুক্ত

১৬. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ আল-কুরআন, ২৪:৩৩

১৭. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ইবনে মাজা, ইমাম, *আসসুনান,* অধ্যায়: আননিকাহ্, অনুচ্ছেদ: মা জাআফী ফাদলিন নিকাহ, প্রাগুক্ত

১৮. خير النكاح ايسره আবূ দাউদ, ইমাম, *আসসুনান,* অধ্যায়: আননিকাহ, অনুচ্ছেদ: ফীমান তাজাওওয়াজা ওয়া লামইউ সাম্মিলাহা সিদাকান.., দিল্লী : আল-মাতবাআ আল-মজীদী, খ্রি. ১৩৫৫

১৯. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ আল-কুরআন, ৫১:৪৯

২০. كلاّ والله ما يخزيك الله ابدًا ، انك لتصل الرحم ، وتحمل الكلّ ، وتقرئ الضيف ، وتكسب المعدوم ، মুসলিম, ইমাম, *আসসহীহ,* অধ্যায়: আলঈমান, অনুচ্ছেদ : বাদউল ওহী, রিয়াদ : দারুসসালাম, খ্রি. ২০০৮, হাদীস নং ২৫৩

২১. هُنَّ لِبَاسٌ لَكُم وَأَنتُم لِبَاسٌ لَهُنَّ আল-কুরআন, ২:১৮৭

২২. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيهِنَّ بِالْمَعرُوفِ আল-কুরআন, ২:২২৮

২৩. فاتقوا الله فى النساء انّ لكم على نساءكم حقًا ولهنّ عليكم حقًا ইবনে হিশাম, *আস্সীরাতুন্ নববিয়্যা,* বৈরূত : 'উলূমুল কুরআন ফাউন্ডেশন, খ্রি. ১৯৮৯, খ.২, পৃ.৬০৪

২৪. والرجل راع على اهل بيته وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية على اهل بيت زوجها وولده وهى مسئولة عنهم মুসলিম, ইমাম, *আসসহীহ,* অধ্যায়: আলইমারাত, অনুচ্ছেদ : আল-জুমুআ ফির কুরাওয়াল সুদুন, প্রাগুক্ত

২৫. يَا آدَمُ اسكُن انتَ وَزَوجُكَ الجَنَّةَ وَكُلا مِنهَا رَغَدًا حَيثُ شِئتُمَا আল-কুরআন, ২:৩৫

২৬. وَمِن آيَاتِه أَن خَلَقَ لَكُم مِن انفُسِكُم أَزوَاجًا لِتَسكُنُوا اِلَيهَا وَجَعَلَ بَينَكُم مَوَدَّةً وَرَحمَةً اِنَّ فِى ذَالِكَ لآيَاتٍ لِقَومٍ يَتَفَكَّرُونَ আল-কুরআন, ৩০:২১

২৭. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا আল-কুরআন, ২৫:৭৪

২৮. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ আল-কুরআন, ৬৫:৬

২৯. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً আল-কুরআন, ৪:৪

৩০. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ আল-কুরআন, ৪:১৯

৩১. خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلى ইবনে মাজা, ইমাম, *আসসুনান,* অধ্যায় : আন নিকাহ, অনুচ্ছেদ : হুসনু মুআশারাতিন নিসা, প্রাগুক্ত

৩২. استوصوا بالنساء خيرًا ، فانّ المرأة خُلقت من ضلع ، وان اعوج ما فى الضلع اعلاه ، فان ذهبت تقيمه كسرته ، وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء বুখারী, ইমাম, *আসসহীহ,* অধ্যায় : আল-আম্বিয়া, অনুচ্ছেদ : খালকি আদাসা ওয়া যুররিয়াতিহ, প্রাগুক্ত

৩৩. ولاتضرب الوجه ولاتقبح ولاتهجر الا فى البيت ইবনে হাম্বল, ইমাম আহমদ, *আলমুসনাদ,* কায়রো: মাতবাআ আশশারকিল ইসলামিয়া, খ্রি.১৮৯৫ খ.৪, পৃ.৪৪৭

৩৪. لا تضربوا اماء الله আবু দাউদ, ইমাম, *আসসুনান,* অধ্যায় : আননিকাহ, অনুচ্ছেদ : ফী দারবিন নিসা, প্রাগুক্ত

৩৫. شرّ الكسب مهر البغى মুসলিম, ইমাম, *আসসহীহ,* অধ্যায়: আলমুসাকাত, অনুচ্ছেদ : তাহরীমু ছামালিল কালব..., প্রাগুক্ত

৩৬. مهر البغى خبيث আবূ দাউদ, ইমাম, *আসসুনান,* অধ্যায় : আলবুয়ূ', অনুচ্ছেদ: ফী কাসবিল হাজ্জাম, প্রাগুক্ত

৩৭. انّ من شرّ الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى الى امراته وتفضى اليه ثمّ ينشر سرّها মুসলিম, ইমাম, *আসসহীহ,* অধ্যায়: আন নিকাহ, অনুচ্ছেদ : তাহরীমু ইফশায়ি সিররিল মারআতি, প্রাগুক্ত

৩৮. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً আল-কুরআন, ৪:৩

৩৯. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ আল-কুরআন, ৪:১২৯

৪০. تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ইবনে হাম্বল, আহমদ, ইমাম, *আল-মুসনাদ,* খ.৪, পৃ. ৪৪৬-৪৪৭

৪১. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ আল-কুরআন, ৬৫:৬

৪২. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ আল-কুরআন, ৪:৩৪

৪৩. خياركم خياركم لنسائهم ইবনে, হাম্বল, ইমাম, আহমদ আলমুসনাদ, প্রাগুক্ত খ. ২, পৃ. ৪৭২

৪৪. ان كره منها خلقا رضى منها اخر আহমদ ইবনে হাম্বল, আলমুসনাদ, প্রাগুক্ত খ.২, পৃ. ৩২৯,

৪৫. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ আল-কুরআন, ৬৫:৬

৪৬. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ আল-কুরআন, ৪:৩২

৪৭. الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ আল-কুরআন, ৪:৩৪

৪৮. المرأة راعية على اهل بيت زوجها وولده وهى مسئولة عنهم বুখারী, ইমাম, *আসসহীহ,* অধ্যায়: আল আহকাম, অনুচ্ছেদ: আতীউল্লাহা ওয়া আতীউর রাসূলা ওয়া উলিল আমরি মিনকুম, প্রাগুক্ত

৪৯. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ আল-কুরআন, ৪:৩৪

৫০. وان غاب عنها نصحته فى نفسها ইবনে মাজা, ইমাম, *আসসুনান,* অধ্যায় : আননিকাহ, অনুচ্ছেদ: আফদালুন নিসা, প্রাগুক্ত

৫১. اذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتاته وان كانت على التنور ইবনে হাম্বল, আহমদ, ইমাম, *আলমুসনাদ,* খ.৪, পৃ.২৩, প্রাগুক্ত

৫২. اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح মুসলিম, ইমাম, *আসসহীহ,* অধ্যায় : আননিকাহ অনুচ্ছেদ : তাহরীমু ইমতিনায়িহা মিন ফিরাশি জাওযিহা, প্রাগুক্ত

৫৩. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ আল-কুরআন, ৩৩:৫৯

৫৪. إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا আল-কুরআন, ৩৩:৩২

৫৫. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا আল-কুরআন, ৪:৪

৫৬. لاتنفق امرأة من بيت زوجها الا باذن زوجها তিরমিযী, ইমাম, *আসসুনান,* অধ্যায়: আযযাকাত, অনুচ্ছেদ: মা জাআ ফিনাফকাতিল মারআতি মিন বাইতি জাওযিহা, প্রাগুক্ত

৫৭. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ আল-কুরআন, ৬:১৫১

৫৮. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ আল-কুরআন, ৪৯:১২

৫৯. اكرموا اولادكم واحسنوا ادبهم ইবনে মাজা, ইমাম, *আসসুনান,* অধ্যায়: আলআদাব, অনুচ্ছেদ: বিররুল ওয়ালিদি ওয়াল ইহসানি ইলাল বানাত, প্রাগুক্ত

৬০. আযযাহাবী, ইমাম, শামসুদ্দীন, বাংলা অনুবাদ, *কবীরা গুনাহ,* ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, খ্রি. ২০০৪, পৃ.১২৮

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ.১২৯

৬২. ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق ইবনে মাজা, ইমাম, *আসসুনান*, অধ্যায় : আততালাক, অনুচ্ছেদ: হাদ্দাছানা সুওয়াইদ ইবনে সাঈদ, প্রাগুক্ত

৬৩. وَاِن خِفتُم شِقَاقَ بَينِهِمَا فَابعَثُوا حَكَمًا مِن اَهلِهِ وَحَكَمًا مِن اَهلِهَا اِن يُّرِيدَا اِصلاَ حًا يُوَفِّقِ اللهُ بَينَهُمَا আল-কুরআন, ৪:৩৫

৬৪. রহীম, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, পৃ.৩৭৯, প্রাগুক্ত

৬৫. فَاِنَّ الاَقَارِبَ اعرَفُ بِبَوَاطِنِ الاحوَال وَاطلَبُ لِلصَّلاَحِ বায়যাবী, আল্লামা নাসিরুদ্দীন, *তাফসীরে বায়যাবী*, তা. বি. খ.১, পৃ.১৮৬

৬৬. لِئَلاَّ تَسبِقَ الظِّنَّةُ اِذَا كَانَا اجنَبِيَين بِالمَيلِ اِلى اَحَدِهِمَا فَاِذَا كَانَ اَحَدُهُمَا مِن قِبَلِه وَالاخَرُ مِن قِبَلِهَا زَالَتِ الظِّنَّةُ وَتَكَلَّمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنهُمَا عَمَّن هُوَ مَن قِبَلِه আল-জাস্সাস, আল্লামা আবূ বকর, *আহকামুল কুরআন*, তা. বি. খ.২, পৃ.২৩১

৬৭. عَلَيكُمَا ان تَجمَعَا اِن تُجمَعَا ، وَاِن رَاَيتُمَا ان تَفرِّقَا ان تُفرِّقَا প্রাগুক্ত, পৃ.২৩২

৬৮. রহীম, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮০

৬৯. اَلطَّلاَقُ مَرَّتَان فَاِمسَاكٌ بِمَعرُوفٍ او تَسرِيحٌ بِاِحسَان আল-কুরআন, ২:২২৯

৭০. রহীম, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮১

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ঃ ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৪, পৃষ্ঠা ৭১-৯৬

দারিদ্র্য নিরসন ও যাকাত

ড.মুহাম্মদ ইউসুফ*

[সারসংক্ষেপ : ইসলাম প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়েছে যে, সে যেন রুজীর অন্বেষণে চেষ্টা চালায়। যাতে সে নিজে এবং নিজের সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ করতে পারে। যদি সম্ভব হয় তাহলে সে আল্লাহর পথে কিছু খরচও করবে। যে ব্যক্তি কোন কাজ করতে পারে না এবং তার নিকট সঞ্চিত অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কোন সম্পদও নেই যা দিয়ে সে নিজের জীবনের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার সচ্ছল আত্মীয়দের উপর। তাকে দারিদ্র্য ও অভাবের দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করা তাদের কর্তব্য। কিন্তু প্রত্যেক গরীব ও অভাবগ্রস্তের এমন সচ্ছল ও বিত্তবান আত্মীয় থাকে না, যে তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে পারে। এ অবস্থায় সে গরীব ও অক্ষম মানুষ কি করবে যার ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব নেয়ার মত কোন নিকটাত্মীয় নেই? অভাবগ্রস্ত ও অক্ষম মানুষ যেমন ইয়াতীম, শিশু, বিধবা মহিলা, অত্যন্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা কি করবে? আর তারাই বা কি করবে যাদের শারীরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও জীবিকা অর্জনের কোন মাধ্যম পায় না? এ ছাড়া সে সকল লোকের কি হবে যারা কাজ করে কিন্তু সে কাজের মাধ্যমে এ পরিমাণ আয় করতে পারে না, যা দিয়ে তার পরিবারের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ হতে পারে? এ সকল লোককে কি দারিদ্র্য, বুভুক্ষ ও অভাবের মধ্যে মৃত্যুর জন্য ছেড়ে দেয়া হবে? আর সমাজ তামাশা দেখবে? অথচ সে সমাজে যথেষ্ট সম্পদশালী বর্তমান রয়েছেন। তারা কি তাদেরকে সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত রাখবে? ইসলাম সমাজের এ ধরনের অভাবগ্রস্ত ও অক্ষম লোকদেরকে উপেক্ষা করেনি। বরং আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য বিত্তবানদের সম্পদে একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, যা আদায় করা তাদের উপর অপরিহার্য কর্তব্য। একেই বলা হয় যাকাত। যাকাতের একমাত্র উদ্দেশ্য হল গরীব-মিসকীনদের অভাব বিমোচনের চেষ্টা করা। যাকাতের হকদারদের মধ্যে ফকীর-মিসকীনরাই তালিকার প্রথমে রয়েছে। বরং কিছু স্থানে তো মহানবী স. যাকাত গ্রহণকারীদের তালিকা বর্ণনাকালে ফকীর মিসকীনদেরকেই শুধু দিতে বলেছেন। যেমন মু'আযকে রা. ইয়ামান প্রেরণকালে তিনি তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সে সমাজের বিত্তবানদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে গরীব-মিসকীনদেরকে তা দেবে। কাজেই এ প্রবন্ধে যাকাতের পরিচয়, দারিদ্র্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, যাকাতের লক্ষ্য ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।]

---

*সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

যাকাতের পরিচয়
ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত। যাকাত যে ফরয তা কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা ও মহানবী স. এর সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। পূর্বের ও পরের গোটা উম্মতের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তা স্বীকৃত।

আভিধানিক অর্থ
যাকাত শব্দটি মাসদার (ক্রিয়ামূল)। অর্থ : البركة والنماء والطهارة والصلاح বরকত, পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া, প্রবৃদ্ধি লাভ, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, শুদ্ধতা-সুসংবদ্ধতা।[১] বলা হয় ঃ زكا 'যে জিনিস ক্রমশ বৃদ্ধি পায় ও পরিমাণে বেশি হয়।' زكا فلان অমুক ব্যক্তি যাকাত দিয়েছে, অর্থ-সুস্থ ও সুসংবদ্ধ হয়েছে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়েছে।

পারিভাষিক অর্থ
الزكاة فى الشرع: تطلق على الحصة المقدرة من المال التى فرضها الله للمستحقين كما تطلق على نفس إخراج هذه الحصة
অর্থাৎ– শরীয়তের দৃষ্টিতে যাকাত শব্দটি ব্যবহৃত হয় সম্পদের ঐ নির্দিষ্ট অংশ বোঝাবার জন্য ধনীদের সম্পদে আল্লাহ যা গরীবদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। এমনিভাবে এ অংশ বের করাকেও যাকাত বলা হয়।[২]

দারিদ্র্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি
ইসলাম চায় মানুষ সুন্দরভাবে অতীব উত্তম ও পবিত্র জীবন যাপন করুক। প্রাচুর্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনকে তারা ধন্য করুক। আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ তারা লাভ করুক। উপর থেকে নাযিল হওয়া এবং তাদের পাদদেশ থেকে নির্গত নিআমতসমূহ তারা ভোগ করুক। সে সৌভাগ্য তারা অনুভব করুক যা তাদের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করে দেবে,পরম শান্তি ও সমৃদ্ধিতে তাদের হৃদয় কানায় কানায় ভরে দেবে। আল্লাহর নিআমতের চেতনায় তাদের মন ও জীবন ভরপুর হয়ে ওঠবে। আল্লাহ তাআলা আদম আ.-কে সৃষ্টি করে বললেন : "হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর।"[৩] তিনি অন্য এক আয়াতে বলেন : "তোমরা খাও এবং পান কর, তবে অপচয় করো না।"[৪] আল্লাহ আরো বলেন : "বলুন, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা'কে হারাম করেছে? বলুন, পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এ সমস্ত তাদের জন্য যারা ঈমান আনে।"[৫]

উপরোক্ত আয়াতসমূহে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ মানুষকে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করার কথা বলেছেন। বস্তুত মানুষের সৌভাগ্য বিধানে বস্তুগত সুযোগ-সুবিধার বাস্তবায়নকে ইসলাম একটা গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ বানিয়ে দিয়েছে। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "তিনটি জিনিস হচ্ছে মহাসৌভাগ্যের অবলম্বন : স্ত্রী যাকে দেখলে তোমার চিত্ত আপ্লুত হয়, তুমি তার থেকে অনুপস্থিত থাকলে সে তার নিজের সতীত্ব ও তোমার ধন-সম্পদ রক্ষা করবে, যানবাহন যা স্থিতিশীল হবে এবং তোমাকে তোমার বন্ধু ও স্বজনদের সাথে মিলিত করবে, আর ঘর-বাড়ি যা প্রশস্ত ও আরামদায়ক হবে।"[৬] অপর এক বর্ণনায় আছে : "চারটি হচ্ছে সৌভাগ্যের উপাদান: সদাচারী স্ত্রী, প্রশস্ত আবাসগৃহ, সত্যবাদী প্রতিবেশী, সহজগম্য যানবাহন। আর চারটি হচ্ছে দুর্ভাগ্যের উপাদান: দুরাচারী প্রতিবেশী, অসৎচরিত্রা স্ত্রী, খারাপ যানবাহন ও সংকীর্ণ বসতঘর।"[৭]

ইসলাম চায় মানুষ ধনে-সম্পদে সৌভাগ্যবান হোক। কোন মানুষ দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় জর্জরিত হোক তা ইসলামের কাম্য নয়। দারিদ্র্যের প্রতি ইসলামের ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং বৈরিতা তখনই তীব্র হয়ে ওঠে যখন দারিদ্র্য বন্টন ব্যবস্থার ত্রুটি, সামাজিক যুল্ম-নিপীড়ন, কারো মাধ্যমে অন্য কারো অধিকার হরণ করার কারণে হয়।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও বস্তুবাদী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য এই যে, বস্তুবাদী সমাজ ব্যবস্থা উদর পূর্তি ও যৌন বাসনা পূর্ণ করাকেই জীবনের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করে। সেখানে বস্তুগত দুনিয়ার সুখ-স্বচ্ছন্দের গন্ডি অতিক্রম করার চিন্তাও করা যায় না। আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই তার চরম ও পরম লক্ষ্য। পৃথিবী হল তার স্বপ্নের স্বর্গ; সে অন্য কোন স্বর্গের চিন্তাও করে না। অন্যদিকে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার লক্ষ্য হল ধনাঢ্যতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাধ্যমে মানুষকে আত্মিকভাবে উন্নত করে তাদের রবের দিকে ধাবিত করা। ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা চায় রুটি-রুযীর অন্বেষণই যেন তাদের একমাত্র কাজ না হয়। আল্লাহর পরিচয়, আল্লাহর সাথে সু-সম্পর্ক রক্ষা, পরকালীন জীবন– যা উত্তম ও স্থায়ী সম্পর্কে অবগত হওয়া থেকে গাফিল হয়ে তারা যেন কেবল খাদ্য যোগারের সংগ্রামে লিপ্ত না হয়।

যখন মানুষের কাছে তাদের নিজেদের এবং তাদের পরিবারের প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ-বিত্ত থাকে তখন তারা নিশ্চিত জীবন-যাপন করতে সক্ষম হয় এবং একাগ্রচিত্তে তাদের প্রতিপালকের ইবাদতের দিকে মনোনিবেশ করতে সমর্থ হয়। যিনি তাদেরকে ক্ষুধার সময় অন্নের যোগান দেন এবং বিপদ আপদ থেকে নিরাপত্তা দেন।

ইসলাম মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য জীবন কামনা করে, তার বড় প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূলকে সচ্ছল বানিয়ে দিয়েছিলেন। কুরআন বলছে : "তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়,অতঃপর অভাবমুক্ত করলেন।"[৮] হিজরতের পর মুসলিমদের প্রতি তাঁর

অপরিসীম অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, "অতঃপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দেন, স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং তোমাদেরকে উত্তম বস্তুসমূহ জীবিকা হিসেবে দান করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।"[৯]

রসূলুল্লাহ স. এর একটি প্রসিদ্ধ দুআ হচ্ছে, "হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে হিদায়াত, তাকওয়া, নৈতিক পবিত্রতা, আরোগ্য ও সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি।"[১০] রসূলুল্লাহ স. আল্লাহর শোকর আদায়কারী ধনী ব্যক্তিকে বিজয়ী ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, "সম্পদশালীরাই পুরস্কার নিয়ে গেল।"[১১]

কুরআন সচ্ছলতা ও স্বচ্ছন্দ জীবনকে নেককার মু'মিন বান্দাদের জন্য আল্লাহ্র তাৎক্ষণিক পুরস্কার এবং দারিদ্র্য ও সংকীর্ণ জীবনকে কাফিরদের জন্য তাৎক্ষণিক শাস্তি হিসেবে বর্ণনা করেছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "মু'মিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয় পবিত্র জীবন দান করব।"[১২] "আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেথায় আসত সর্বদিক থেকে তার প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল, ফলে তারা যা করত তজ্জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদনের।"[১৩]

এসব আয়াত ও হাদীসের আলোকে আমরা বলতে পারি, অনেকে দারিদ্র্যকে যেভাবে মহান মনে করেন এবং ধনাঢ্যতাকে ঘৃণা করেন তা কোনো অবস্থায়ই ঠিক নয়। তা পারসিক চিন্তাধারা, ভারতীয় বৈষ্ণববাদী চিন্তাধারা, খৃষ্টীয় চিন্তাধারা। এসব ইসলামের চিন্তাধারা নয় বরং বাইরে থেকে ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী চিন্তাধারা এবং বিদআত।[১৪]

পৃথিবীতে মানুষের দায়িত্ব এবং মহান আল্লাহর নিকট তার সম্মান ও মর্যাদা– উভয়ই যুগপতভাবে দাবি করে যে, দারিদ্র্য ব্যক্তিকে নিজের ও তার আল্লাহকে বিস্মৃত হতে বাধ্য করে, তার দীন ও দুনিয়া সম্পর্কে তাকে উদাসীন বানায়, তাকে তার দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। সে কেবল তার ক্ষুধা নিবৃত্তি, লজ্জানিবারণ ও আশ্রয় অর্জনের চিন্তায়ই দিন-রাত মশগুল থাকতে বাধ্য হয়। শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীতে এ বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "ইসলাম দারিদ্র্য ও লোকদের অভাব-অনটনকে ঘৃণা করে। কেননা ইসলাম চায় তাদের বৈষয়িক জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন যথাযথভাবে পূরণ হোক– যেন সে এর চেয়ে বড় ও জাতীয় ব্যাপারসমূহে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়-যা মানবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। "আমি তো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে

তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম রিয্ক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি"[১৫]।[১৬]

আল্লাহ মানুষকে কার্যত সম্মানিত করেছেন বিবেক-বুদ্ধি, পারস্পরিক আকর্ষণ এবং দৈহিক প্রয়োজনেরও উর্ধ্বে আধ্যাত্মিক ভাবধারা ও চেতনা দিয়ে। এক্ষণে জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রাচুর্য থাকলেই মানুষ এসব চিন্তামূলক ক্ষেত্রেও আধ্যাত্মিক চেতনা পরিতৃপ্ত রাখার সুযোগ পেতে পারে। আর যদি তা না থাকে তাহলে তারা এ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে নিতান্তই জীব-জন্তুর পর্যায়ে নেমে যায়। পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকে না।

মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা। তাকে খলীফা বানানো হয়েছে এ উদ্দেশে যে, সে এ দুনিয়ার জীবনকে সমৃদ্ধি করবে, তাকে উন্নত করে তুলবে। পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলবে। পরে তার সৌন্দর্য সমৃদ্ধি সে উপভোগ করবে। তারপরে আল্লাহর দেয়া এ নিআমতসমূহের শোকর আদায় করবে। কিন্তু মানুষ এসবের কোন একটাও করতে পারে না যদি তার জীবনটাই নিঃশেষ হয়ে যায় একমুঠি অন্নের সন্ধানে। কেউ তার জীবনের প্রয়োজন একমুঠো অন্নই যদি সংস্থান করতে গলদঘর্ম হয়, তাহলে সে তার জীবনটা কীভাবে কাটাবে ?

কোন মানুষকে যদি তার দারিদ্র্যের দন্ত দংশন করতে থাকে, প্রয়োজনের আঘাত যদি তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয় এবং তার আশপাশের লোকেরা যদি সুখে বাস করে, সে যদি তাদেরকে সম্পদের পাহাড় গড়তে দেখে, তারা যদি তার দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত না করে, তাকে যদি ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়, তাহলে সে ব্যক্তির মনে হিংসা-বিদ্বেষ দানা বেধে ওঠতে পারে? সে ঐ সমাজের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করতে পারে? সে তার সমাজের কল্যাণের কোন চিন্তাই করতে পারে না।

ইসলামে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সৌভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। সৌভ্রাতৃত্বের মূল কথা হল অভিন্ন মনুষ্যত্ব ও আকিদা বিশ্বাসের পরম ঐক্য ও একাত্মতা। ইসলামের আহবান, "তোমরা সকলে আল্লাহর বান্দাহ হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও।"[১৭] "মুসলিম মুসলিমের ভাই।"[১৮] কিন্তু এক ভাই যদি পেট ভরে খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে এবং অন্য ভাই যদি ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করতে থাকে, ধনী ভাই যদি দরিদ্র ভাইয়ের অবস্থা দেখে তার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দেয় তাহলে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব কখনই স্থায়ী হতে পারে না।

এর অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে, ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ছিন্নভিন্ন করা এবং ধনী ও পরিতৃপ্ত লোকদের বিরুদ্ধে গরীব ও নিঃস্বদের হৃদয়ে হিংসা-বিদ্বেষের আগুন প্রজ্বলিত করা। কিন্তু ইসলাম তা চায় না। ইসলাম মুসলিম সমাজকে তা থেকে দূরে রাখতে

বদ্ধপরিকর। কেননা হিংসা-বিদ্বেষ এমন রোগ যা মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে, এমন বিপদ যা মানুষকে হত্যা করে, এমন মহামারী যা ব্যক্তি ও সমাজকে পর্যুদস্ত করে।

ইসলাম এসব সামষ্টিক মনস্তাত্ত্বিক রোগসমূহ কেবল ওয়ায-নসীহত করেই মুকাবিলা করেনি বরং তা সমাজ থেকে চিরতরে দূর করার জন্য গ্রহণ করেছে বাস্তব ও কার্যকর পদক্ষেপ। কেননা একজন ক্ষুধার্ত, নিরন্ন, বঞ্চিত, বিবস্ত্র মানুষকে হিংসা-বিদ্বেষের বিপদ বিপর্যয় সম্পর্কে একটি মর্মস্পর্শী ওয়ায-নসীহত শুনিয়ে দেয়া কখনও যথেষ্ট হতে পারে না। তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই তো দুঃখময়, শুষ্ক ও নির্মম। আর তার চতুষ্পার্শ্বের মানুষদের রয়েছে বিত্ত-বৈভবের মহাসমারোহ। তারা বিলাসী আরাম-আয়েশের জীবন ধারায় ব্যস্ত। নিরন্ন বিবস্ত্র মানুষটির দিকে চোখ তুলে তাকাবার সময়টুকু পর্যন্ত তাদের নেই। সুতরাং এই অবস্থায় অসহায় মানুষটির হৃদয়পটে হিংসা জাগা, বিদ্বেষের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠাই স্বাভাবিক। এ কারণেই ইসলাম যাকাত ফরয বা বাধ্যতামূলক করেছে। যেন বেকার কাজ পায়, অক্ষম অসহায় মানুষ বাঁচার নিরাপত্তা পায়, ঋণী ব্যক্তির ঋণ শোধের ব্যবস্থা হয়, নিঃস্ব পথিক যেন আপনজনের কাছে ফিরে যেতে পারে। তবেই মানুষ অনুভব করতে পারবে তারা একে অপরের ভাই, বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক। প্রয়োজন ও অভাবের সময় অন্যের ধন-সম্পদ তারই সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। ব্যক্তি মনে করবে তার ভাইয়ের শক্তি তারই শক্তি যদি সে দুর্বল হয়ে পড়ে, তার ভাইয়ের ধন তারই ধন যদি সে দরিদ্র হয়ে পড়ে। বস্তুত এরূপ পরিচ্ছন্ন পরিবেশেই ঈমানের ছায়া বিস্তার হওয়া সম্ভব। এরূপ সমাজেই লোকদের মাঝে জাগতে পারে দয়া-মায়া, ভালবাসা, স্নেহ-প্রেম ও ত্যাগ-তিতিক্ষা। রসূলুল্লাহ্ স. এর বাণী, "তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।"[১৯]

যাকাতের লক্ষ্য এবং সমাজ-জীবনে তার প্রভাব

যাকাতের সামাজিক সামষ্টিক লক্ষ্য স্পষ্ট। যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহের উপর চোখ বুলালেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তার উপর এক ত্বরিত দৃষ্টিও আমাদের সম্মুখে এ মহাসত্য প্রতিভাত করে তোলে যেমন রাতের অবসানে পৃথিবী চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে। সূরা তওবার এ আয়াতটি যখন আমরা পাঠ করি : "সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ-ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। তা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[২০] এ থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, দারিদ্র্য ও অভাব অনটন দূর করাই যাকাতের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য। যাকাত ধনী

ও দরিদ্রের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠনে সহায়তা করে। কারণ যাকাত নির্ধনকে ক্রমান্বয়ে ধনী করে তোলে। পক্ষান্তরে সুদ গরীবকে নিঃস্ব করে এবং ধনীকে সম্পদের পাহাড় গড়তে সাহায্য করে। যাকাত দ্বিতীয় পথকে চিরতরে বন্ধ করে দেয়।

যাকাতের প্রধান লক্ষ্য

যাকাতের প্রধান লক্ষ দারিদ্র্য নিরসন। যাকাত বণ্টনের আটটি খাতের (ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী কর্মচারীও কর্মকর্তা, নও মুসলিম, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর রাস্তা ও মুসাফির) মধ্যে চারটি খাতই (ফকীর, মিসকীন, দাসমুক্তি ও মুসাফির) সর্বস্বান্ত, অসহায়, নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্য নির্দিষ্ট। এর দ্বারা বোঝা যায় যাকাতের লক্ষই হল দারিদ্র্য বিমোচন।

ফকীর ও মিসকীন

যাকাত ব্যয়ের আটটি খাতের মধ্যে প্রথম দুটি হচ্ছে ফকীর ও মিসকীন। যাকাতের সম্পদে তাদের জন্যই আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ থেকেই যাকাত ব্যবস্থা প্রচলনের লক্ষ্য বোঝা যায়। ইসলামী সমাজে দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন স্থায়ী হতে পারে না। এর বড় প্রমাণ যাকাত ব্যয়ের খাত বিষয়ে কথা শুরু করে কুরআন মাজীদ সর্বাগ্রে ফকীর-মিসকীনদের কথা বলেছে। আরবী কথনরীতির নিয়ম হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সবার আগে বলা। দারিদ্র্য দূর করা ও ফকীর-মিসকীনদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানই যাকাত ব্যবস্থার আসল উদ্দেশ্য। সে কারণে নবী কারীম স. কোন কোন হাদীসে শুধু এ কথাটিরই উল্লেখ করেছেন। তিনি মু'আয রা. কে যখন ইয়ামানে পাঠাচ্ছিলেন তখন তাকে বললেন, "তাদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করে তাদের গরীব লোকদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হবে।"[২১]

আত্মসম্মান রক্ষাকারী দরিদ্ররা যাকাত পাওয়ার যোগ্য

অধিকাংশ মানুষ মনে করে, যারা মানুষের কাছে ভিক্ষা করাকে নিজেদের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে, যারা নিজেদের দরিদ্রতা ও নিঃস্বতার কথা প্রকাশ করে বেড়ায়,সভাস্থল,বাজার ও মসজিদের দরজায় যারা সকাল-সন্ধ্যায় নিজেদের হাত প্রসারিত করে দেয়, তারাই মিসকীন, তারাই দরিদ্র। রসূলুল্লাহ স. প্রকৃত অভাবী ও মিসকীন এর পরিচয় তুলে ধরেছেন যারা সত্যিকার অর্থে সমাজের সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত। রাসূল স. এ ব্যাপারে বলেছেন : "সে ব্যক্তি মিসকীন নয়, যাকে একটি খেজুর বা দু'টি খেজুর অথবা এক মুষ্ঠি বা দুই মুষ্ঠি খাবার দেয়া হয়। প্রকৃত মিসকীন

সে ব্যক্তি যে আত্মসম্মানের কারণে ভিক্ষা করে না। তোমরা ইচ্ছা করলে পাঠ করতে পার। মহান আল্লাহর বাণী– "যারা লোকদের জড়িয়ে ধরে ভিক্ষা চায় না"।[২২] অর্থাৎ কাঁদ কাঁদ হয়ে ভিক্ষা চায় না, ভিক্ষা দিতে লোকদের বাধ্য করে না। নিশ্চয় যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও মানুষের কাছে চায় সে মানুষদেরকে দিতে বাধ্য করে এবং কাঁদ কাঁদ হয়ে ভিক্ষা চায় সে মিসকীন নয়। এর দ্বারা ঐ মুহাজিরদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের সবকিছু পরিত্যাগ করে চলে এসেছেন। এদের ধন-সম্পদ ও আয়-উপার্জন কিছুই নেই, যা দ্বারা তাঁরা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন।[২৩] এ সকল লোকের প্রশংসায় আল্লাহ তাআলা বলেন, "তা প্রাপ্য অভাবগ্রস্ত লোকদের; যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময় ঘুরাফিরা করতে পারে না; যাচঞা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে মনে করে; তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে যাচঞা করে না।"[২৪]

এ মিসকীনই সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি। যদিও এ মিসকীন সর্ম্পকে লোকেরা উদাসীন থাকে। এজন্যই রসূল স. এ ধরনের লোকদের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তাদের তালাশে মানুষদেরকে বুদ্ধি-বিবেক নিয়োগ করতে বলেছেন। অনেক ঘরের অধিবাসীরা, অসংখ্য আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি এভাবে নিরবে-নিভৃতে নিঃস্ব জীবন যাপন করছে। এদেরকে খুঁজে বের করে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিলে তারা অভাবমুক্ত হতে পারে। এরা অনেকেই অবস্থার দুর্বিপাকে পড়ে গেছে বা অক্ষমতা তাদেরকে দরিদ্র বানিয়েছে, অথবা সন্তান-সন্ততি বেড়ে গেছে কিন্তু তাদের সম্পদ কমে গেছে, অথবা তাদের উপার্জন তাদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম।

হাসান বসরী র. কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এক ব্যক্তির ঘর-বাড়ি আছে, খাদিম আছে সে যাকাত গ্রহণ করতে পারবে কি না ? জবাবে তিনি বলেছেন, সে যদি অভাব বোধ করে তাহলে যাকাত গ্রহণ করতে পারে, তাতে তার কোন দোষ নেই।[২৫]

ফকীর ও মিসকীনকে যাকাত থেকে কি পরিমাণ দেয়া যাবে ?

ফকীর ও মিসকীনকে কি পরিমাণ যাকাত দেয়া যাবে তা নিয়ে ইমামদের মাঝে একাধিক অভিমত রয়েছে। নিম্নে সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল–

ক. জীবনকালের প্রয়োজন পরিমাণ দান : এ মত অনুযায়ী ফকীরকে এতটা পরিমাণ দান করতে হবে,যার দ্বারা তার দারিদ্র্যের মূলোৎপাটন হয়ে যায়। তার অভাব-অনটন দূর হওয়ার কারণ ঘটে এবং স্থায়ীভাবে তার প্রয়োজন যথেষ্ট মাত্রায় পূরণ হতে পারে। দ্বিতীয়বার সে যেন যাকাত গ্রহণের মুখাপেক্ষী না হয়। ইমাম নববী বলেছেন, ইরাকী ও অধিকাংশ খোরাসানী ফকীহ বলেছেন, ফকীর-মিসকীনকে এত অধিক

পরিমাণ দিতে হবে যা তাদেরকে দারিদ্র্য মুক্ত করে সচ্ছলতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। ইমাম শাফিয়ী র. নিজেও এ মত পোষণ করেন। তাঁরা তাদের মতের স্বপক্ষে কুবাইসা ইব্‌নুল মুখারিক আলহিলালী বর্ণিত একটি হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেন। হাদীসটি হল, রাসূল স. বলেছেন, "তিন শ্রেণীর লোকের জন্য ভিক্ষা করা বৈধ। প্রথম, যার উপর এমন বোঝা চেপেছে যে, তার জন্য ভিক্ষা করা হালাল হয়ে গেছে, যতক্ষণ সে সেই পরিমাণ না পাচ্ছে। তা পেয়ে গেলে সে ভিক্ষা করা থেকে বিরত থাকবে। দ্বিতীয় এমন ব্যক্তি, যে বড় মুসিবতের বা দুরাবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে, তার সমস্ত ধন-সম্পদ নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার জন্য ভিক্ষা বৈধ, যতক্ষণ না সে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাত্রার মালিক না হচ্ছে। তৃতীয় ব্যক্তি যে অনশনের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এমনকি তার কওমের লোকদের মধ্য থেকে অন্তত তিনজন বলতে শুরু করেছে যে, অমুক ব্যক্তি না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। এ ব্যক্তির জন্য ভিক্ষা বৈধ। যতক্ষণ না সে তার স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনে ফিরে আসে। হে কুবাইসা! এ তিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্য ভিক্ষা করা ঘুষ ছাড়া কিছুই নয়। এরা ছাড়া অন্য যে কেউ ভিক্ষা করে সে ঘুষ খায়।"[২৬]

অর্থাৎ প্রয়োজন পূরণ না হওয়া পর্যন্ত নবী কারীম স. ভিক্ষার অনুমতি দিয়েছেন। যদি সে উপার্জন করার মত কোন পেশা অবলম্বন করতে চায়, তাহলে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী, হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি তাকে ক্রয় করে দিতে হবে। তার মূল্য কম হোক বা বেশি হোক। যার দ্বারা সে এই পরিমাণ আয় করতে পারে যে, তার প্রয়োজন যথা সম্ভব পূরণ হয়। তবে স্থান, কাল ও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পেশা ভিন্ন হতে পারে। যে শাক-সবজি বিক্রয় করতে পারে, তাকে পাঁচ বা দশ দিরহাম দেয়া যেতে পারে। আর যে লোকের পেশা হীরা-জহরত ও স্বর্ণ-রৌপ্য বিক্রয় তাকে দশ হাজার দিরহাম পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে, যদি তার চেয়ে কম পরিমাণ দ্বারা প্রয়োজন পরিমাণ আয় করা না যায়। আর যে ব্যবসায়ী, রুটি প্রস্তুতকারী, বা আতর প্রস্তুতকারী বা মুদ্রা বিনিময়কারী তাকে সে অনুপাতে যাকাতের অর্থ দেয়া যেতে পারে। যে দর্জি, কাঠমিস্ত্রি, কসাই বা কোন শিল্পকর্মে পারদর্শী তাকে এতটা পরিমাণ দিতে হবে যাতে সে তার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে পারে। যদি সে কৃষিজীবী হয়, তাহলে তাকে এমন পরিমাণ জমির ব্যবস্থা করে দিতে হবে, যেখানে সে ফসল ফলিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। যদি সে এই ধরনের পেশা গ্রহণে সক্ষম না হয়, কোন শিল্পদক্ষতারও অধিকারী না হয়, ব্যবসা বা অন্য কোন উপার্জনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তাকে তার বসবাসের স্থানের উপযোগী জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।[২৭]

উমর রা. উক্ত মতকে সমর্থন করেন। কেননা এই নীতি যুক্তিসঙ্গত ও যথার্থ। তিনি বলেছেন, "যখন তাদেরকে (গরীবদেরকে) দেবে তখন ধনী বানিয়ে দেবে, সচ্ছল বানিয়ে দেবে।"[২৮] উমর রা. এর নীতি ছিল তিনি যাকাত দিয়ে বাস্তবিকই ফকীর লোকদের সচ্ছল বানিয়ে দিতেন। কয়েক লোকমা খাদ্য দিয়ে বা কয়েক দিরহাম সাহায্য দিয়ে তাদের ক্ষুধা নিবারণ করেই ক্ষান্ত হতেন না। তাঁর সময়ে এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে নিজের দুরবস্থার বর্ণনা দিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করল। তিনি তাকে দারিদ্র্য থেকে বাঁচানোর জন্য তিনটি উট দিয়ে দিলেন। সে সময় উট ছিল সবচেয়ে উপকারী মূল্যবান সম্পদ। তিনি যাকাত বণ্টনকারী কর্মচারীদের নির্দেশ দিলেন যোগ্য লোকদের মাঝে তা বণ্টনের জন্য এবং বললেন, "তোমরা যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে বারবার তা বণ্টন কর, তাতে তাদের কেউ একশটি উট পেলেও সমস্যা নেই।"[২৯] দরিদ্রদের প্রতি তাঁর নীতি ঘোষণা করে তিনি বলেন, "আমি তাদের বারবার যাকাত দেব তাদের কেউ একশটি করে উট পেয়ে গেলেও।"[৩০] বিশিষ্ট ফকীহ আতা র. বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি তার মালের যাকাত কোন মুসলিম পরিবারের লোকদের মাঝে বণ্টন করে, সে যেন বেশি পরিমাণে দেয়, সেটাই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।"[৩১]

এ অভিমত অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র যাকাতের অর্থ দিয়ে বড় বড় কল-কারখানা,খামার ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে, যার কিছু অংশের বা সবটার মালিক হবে কেবল গরীব লোকেরা। যেন তার আয় দ্বারা তাদের সম্মানজনক জীবিকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। তারা এসবের মালিক হলেও তা বিক্রি করার বা মালিকানা হস্তান্তর করার কোন অধিকার তাদের থাকবে না। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান প্রায় 'ওয়াকফ' সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে স্থায়ী হয়ে থাকবে।[৩২]

খ. এক বছরের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দিতে হবে : মালিকী, হাম্বলী ও অন্যান্য মতের সাধারণ ফিক্‌হবিদগণের মতে, ফকীর ও মিসকীনকে যাকাত থেকে এ পরিমাণ সম্পদ দিতে হবে যা তার ও তার উপর নির্ভরশীল লোকদের এক বছরের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হবে। তারা সারা জীবনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দেয়াকে সমর্থন করেন না । রসূল স. এর অনুসৃত নীতিতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। কেননা সহীহ সূত্রে একথা বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল স. তাঁর পরিবারের জন্য এক বছরের খাবার মজুদ করে রাখতেন। [৩৩] তাছাড়া যাকাতের মাল তো সাধারণত বাৎসরিক হিসেবে প্রদান করা হয়। কাজেই সারা জীবনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দেয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। প্রতি বছর যাকাতের খাতে নতুন নতুন সম্পদ আসবে সেখান থেকে উপযুক্ত লোকদের মাঝে বার্ষিক হিসেবে বণ্টন করা হবে, এটাই যুক্তিযুক্ত।

উপযুক্ত মানের জীবিকার ব্যবস্থা

এ আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যাকাত দেয়ার লক্ষ ফকীর-মিসকীনকে একটি বা দু'টি দিরহাম দিয়ে দেয়া নয়। আসলে লক্ষ হচ্ছে, উপযুক্ত জীবিকার ব্যবস্থা করে দেয়া। লক্ষ রাখতে হবে, সে একজন মানুষ। আল্লাহ্ তাকে মর্যাদাবান বানিয়েছেন, পৃথিবীর বুকে তাকে আল্লাহ তাঁর খলীফা বানিয়েছেন। উপরন্তু অনুগ্রহ ও সুবিচারের প্রবর্তক দীন ইসলামে সে বিশ্বাসী একজন মুসলিম। সে সেই উত্তম উম্মতের একজন, যাকে বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ মান অনুপাতে কমছে-কম যে ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক, তা হচ্ছে, ফকীর-মিসকীন ব্যক্তি ও তার পরিবারবর্গের জন্যে খাদ্য, পানীয়, শীত-গ্রীষ্মের উপযোগী পোশাক এবং উপযুক্ত ও সুবিধাজনক একটি বাসস্থান।

ইমাম নববী র. অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য যাকাত ফান্ড থেকে দেয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আলিমগণ বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের এবং সেই সাথে আরো যা একান্ত দরকার সে সবের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা আবশ্যক। অবশ্য কোনরূপ অপচয় বা বেহুদা খরচ যেন না হয়, সে সঙ্গে কার্পণ্যও দেখানো না হয়, সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। এ ব্যবস্থা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে যেমন হতে হবে, তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির জন্যেও। অবশ্য একালের লোকদের প্রত্যেকের জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়াও একান্ত প্রয়োজন। সে শিক্ষা যে শিক্ষায় দীনের হুকুম-আহকাম শেখা হবে। মূর্খতার অন্ধকার থেকে বাঁচা, ভদ্র শালীন জীবন যাপনের পদ্ধতি জানা, বৈষয়িক দায়িত্ব পালনে যোগ্য করে তোলার জন্য এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শিক্ষার প্রয়োজন মূর্খতা দূর করার জন্য। কেননা মূর্খতা, জ্ঞান ও সংস্কৃতি উভয় দিক দিয়েই মৃত্যুর সমান, মূর্খ ব্যক্তি তাৎপর্যগতভাবে মৃত।

এ যুগে প্রত্যেকের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়াও আবশ্যক। কোন ব্যক্তি বা তার পরিবারবর্গের কেউ অসুস্থ হলে তাকে সুস্থ করে তোলার ব্যবস্থা করা দরকার। হাদীসে বলা হয়েছে, "হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। কেননা আল্লাহ তাআলা এমন কোন রোগের সৃষ্টি করেননি,যার জন্য কোন ঔষধের ব্যবস্থা করেননি"।[৩৪] আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, "এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ কর না।"[৩৫] "এবং একে অপরকে হত্যা কর না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।"[৩৬] সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে, "মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার উপর যুল্‌ম করতে পারে না, তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়েও দিতে পারে না।"[৩৭] কাজেই কোন মুসলিম ব্যক্তি বা সমাজ-সমষ্টি যদি অপর কোন ব্যক্তিকে অসহায় অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়, রোগ তাকে ধ্বংস করতে থাকে

এবং তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা না হয়, তাহলে সে অসহায় হয়ে যাবে। সে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হবে।
বস্তুত কোন ব্যক্তির সাধারণ জীবনমান স্থায়ী ও অপরিবর্তনের নিশ্চয়তা দেয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা তা সময় ও অবস্থার পার্থক্যের কারণে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। প্রত্যেক জাতির আর্থিক অবস্থা ও আয়ের তারতম্যের কারণেও এ পার্থক্য অনস্বীকার্য হয়ে পড়ে। অনেক জিনিস এমনও আছে যা এক এক অবস্থায় পূর্ণাঙ্গ বিবেচিত হয়। এক সময় একটা জিনিস অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে, কিন্তু অপর অবস্থায় তার সেরূপ আবেদন থাকে না।

স্থায়ী ও সুসংবদ্ধ সাহায্য ব্যবস্থা

যে ফকীর বা মিসকীন কোন ভাল পেশা অবলম্বনে সমর্থ নয়, এমন কোন শ্রমও করতে পারে না যা তার পরিবারবর্গের জন্য উপযুক্ত ও যথেষ্ট পরিমাণে জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করতে পারবে, যাকাত বণ্টনের ভিত্তি হিসেবে তার জন্য এক বছর ব্যাপী যথেষ্ট পরিমাণে দানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ হচ্ছে যাকাতের লক্ষ। এ ব্যবস্থা এক মাস বা দুই মাসের জন্যে হলে চলবে না। বরং এ ধরনের যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোকদের জন্যে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর ফলেই এক ব্যক্তি বা একটি পরিবারের দারিদ্র্য সচ্ছলতায় রূপান্তরিত হতে পারে । তার দুর্বলতা ও অক্ষমতা দূর হয়ে শক্তি ও সামর্থ্য এবং মর্যাদা লাভ সম্ভব হতে পারে। বেকারত্ব দূর হয়ে কর্মব্যস্ততা ও উপার্জনের তৎপরতা শুরু হতে পারে। এ পর্যায়ে ইমাম আবূ উবায়দ যে বর্ণনার অবতারণা করেছেন তা এখানে আলোচনা করা যেতে পারে।
একবার উমর রা. মধ্যাহ্নে একটি গাছের ছায়ায় শায়িত ছিলেন। এমন সময় একজন বেদুঈন মহিলা এসে উপস্থিত হল। লোকেরা অবশ্য তা লক্ষ করছিল। মহিলাটি বলল, "আমি একজন মিসকীন মেয়েলোক আর আমার ছেলেপেলেও রয়েছে। আমীরুল মুমিনীন উমর রা. মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণকারী নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে কিছুই দেননি। এরূপ অবস্থায় সম্ভবত আপনি আমার জন্য তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারেন। একথা শুনে উমর রা. মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে ডেকে পাঠালেন। মহিলাটি বলল, আমার জন্যে এ ব্যবস্থা মঙ্গলজনক হতে পারে যে, আপনিই আমাকে নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হবেন। তিনি বললেন : হ্যাঁ তাই করা হবে, ইনশাআল্লাহ। পরে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা উপস্থিত হয়ে সালাম দিয়ে বললেন, আমি হাযির, নির্দেশ করুন, হে আমীরুল মুমিনীন ! এ কথা শুনে মহিলাটি ভয়ানক লজ্জা পেল। উমর রা. বললেন, আল্লাহর শপথ ! আমি তো তোমাদের কল্যাণ চাইতে ত্রুটি করি না। কিন্তু আল্লাহ্

যখন তোমাকে এ মেয়েলোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন, তখন তুমি কি জবাব দেবে? এ কথা শুনে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামার দু' চোখ দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল। পরে উমর রা. বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি তাঁর রসূল স. কে পাঠিয়েছেন। আমরা তাঁকে সত্য নবীরূপে মেনে নিয়েছি এবং তাঁর পূর্ণ অনুসরণ করছি। তিনি আল্লাহর নির্দেশ ও বিধান অনুযায়ী কাজ করে গেছেন। তিনি সদকা-যাকাত মিসকীনদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। পরে আবূ বকর রা. খলীফা হলেন। তিনি রসূলের সুন্নত অনুযায়ী আমল করে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। তারপর আমাকে খলীফা বানানো হয়েছে। আমি তো তোমাদের মধ্য থেকে উত্তম লোকদেরই বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করেছি। আমি যদি তোমাকে পাঠাই, তাহলে এক বছরের যাকাত পরিমাণ এ মহিলাকে দেবে। আর আমি জানি না, সম্ভবত আগামী বছর আমি তোমাকে পুনরায় পাঠাব কি না। পরে মেয়েলোকটির জন্য কিছু ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলেন। ফলে তাকে এক উট বোঝাই ময়দা ও জয়তুন তেল দেয়া হল। তিনি তাকে বললেন, এখনকার মত তুমি এসব নিয়ে যাও। পরে খায়বারে তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। আমি খায়বার যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। পরে মহিলাটি খায়বরে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি মহিলাটিকে দু'টি উট দিয়ে বললেন, এ উট দু'টি নিয়ে যাও। সম্ভবত মুহাম্মাদ ইব্‌নে মাসলামার আগমন পর্যন্ত এ দিয়ে তোমার চলে যাবে। আমি তাকে নির্দেশ দিয়েছি, তোমাকে বিগত এক বছর ও আগামী বছরের প্রয়োজন পূরণ করে দিতে।[৩৮]

এ ঘটনার বিবরণ থেকে অনেক মূল্যবান মূলনীতি জানা যায়–

১. ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী প্রতিটি নাগরিকের প্রতি শাসক ও প্রশাসকের কঠিন দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা রয়েছে। এ বিষয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসক 'খলীফাতুল মুসলিমীন' অত্যন্ত সচেতম ছিলেন।

২. ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দ তাদের উপযুক্ত জীবিকা পাওয়ার অধিকার রাখে এবং সে বিষয়ে তারা পূর্ণমাত্রায় সচেতন। রাষ্ট্রই এ অধিকার আদায়ের ব্যবস্থা করবে।

৩. ইসলামী সমাজে জীবিকার নিরাপত্তা বিধানে যাকাত হচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়ের আর্থিক সাহায্য।

৪. এ সাহায্য ছিল স্থায়ী। যদি কেউ তার অংশ না পায়, তাহলে সেজন্য অভিযোগ করতে পারে, তার প্রতিকার চাইতে পারে, এ অধিকার প্রতিটি যাকাত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিরই রয়েছে।

৫. উমরের রাষ্ট্রনীতিতে এতটা পরিমাণ দেয়ার নিয়ম ছিল যা প্রাপকদের জন্যে যথেষ্ট হয়, তাদের পরমুখাপেক্ষিতামুক্ত ও ধনী বানিয়ে দেয়। তিনি মহিলাটিকে

> ময়দা ও জয়তুন বোঝাই উট দিয়ে দিলেন। পরে তার সঙ্গে আরো দু'টি উট মিলিয়ে দিলেন। আর এই গোটা দানকে তিনি সাময়িক দান হিসেবে গণ্য করেছিলেন, যতক্ষণ না মুহাম্মদ ইব্‌নে মাসলামা এসে তাকে বিগত বছর ও আগামী বছরের সামষ্টিক প্রয়োজন এক সাথে দিলেন।

এর দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, উমর রা. এ কাজ সর্বপ্রথম করেননি। এ ক্ষেত্রেও তিনি নবী করীম স. ও প্রথম খলীফা আবূ বকর রা. এর অনুসারী ছিলেন।[৩৯]

আলগারিমূন– ঋণগ্রস্ত লোকগণ

কুরআনে বর্ণিত যাকাত ব্যয়ের আরেকটি খাত হচ্ছে, আল গারিমূন বা ঋণগ্রস্ত লোকগণ। 'গারিমূন' শব্দটি বহুবচন। এর একবচন 'গারিম' غارم। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে 'গারিম' বলা হয়। যার উপর ঋণের বোঝা চেপেছে।

প্রথমতঃ নিজের জন্য ঋণ গ্রহণকারী

এমন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, যে স্বীয় কল্যাণের জন্য ঋণ গ্রহণ করেছে। সে পোষ্যদের ভরণ-পোষণ, কাপড়-চোপড় ক্রয়, বিয়ে-শাদী, রোগের চিকিৎসা, গৃহ নির্মাণ, আসবাবপত্র ক্রয়, ভুলবশত অপরের জিনিস নষ্ট করে ফেলা অথবা এ ধরনের কোন প্রয়োজনীয় কাজে ঋণ করেছে।

আকস্মিক বিপদগ্রস্তরা এই পর্যায়ে গণ্য

যে সব লোক আকস্মিকভাবে জীবনের কঠিনতম সময়ে নিপতিত হয়েছে, তারা এমন সব আঘাত পেয়েছে যে তাতে তাদের ধন-সম্পদ সবই নিঃশেষ হয়ে গেছে। তখন তারা নিজেদের ও পারিবারিক প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। মুজাহিদ বলেছেন, "তিন শ্রেণীর লোক 'ঋণগ্রস্ত' বা 'গারিমরূপে গণ্য– একজন, যার ধন-মাল,ফসল-ফল বন্যায় ভেসে গেছে। দ্বিতীয়জন যার সবকিছু জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে আর তৃতীয়জন যার বহু সন্তান ও পরিজন কিন্তু তার ধন-মাল বলতে কিছুই নেই। সে ঋণ নিয়ে পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় করতে বাধ্য হয়।"[৪০]

দ্বিতীয়তঃ অন্যের কল্যাণে বা সমাজ-সমষ্টির কল্যাণে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি

ঋণগ্রস্তদের দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে, সমাজের এমন এক শ্রেণী যারা ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও সম্মানিত, যারা বড় হৃদয়বান, উদার ও দৃঢ়তাসম্পন্ন। মুসলিম সমাজেই এ ধরনের লোক পাওয়া যায়। এরা পারস্পরিক অবস্থার সংশোধন ও উন্নয়নের কাজে নেমে অনেক সময় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যেমন, একটি বিশাল জনসমষ্টির দু'টি গোত্র বা দু' গ্রামের লোকেরা রক্তপণ ও ধন-সম্পদ নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়। এর কারণে তাদের

মাঝে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। তখন একজন অগ্রসর হয়ে বিবদমান জনসমষ্টির মাঝে সন্ধি করিয়ে দিতে চেষ্টা চালায়। সে সময় সে বিবাদ-মীমাংসার জন্য পারস্পরিক বিবাদের কেন্দ্রবিন্দু কোন ধন-সম্পদের দায়িত্ব নিজের যিম্মায় নিয়ে নেয়। এটা অনেক দিন থেকে চলে আসা একটি প্রথা। এরূপ অবস্থায় যিম্মার বোঝাটা যাকাতের 'গারিমূন' এর খাত থেকে বহন করা যাবে যেন সমাজের সংশোধন প্রয়াসী কল্যাণকামী নেতৃবৃন্দ নিজেদের উপর এ বোঝা চাপিয়ে নিয়ে নিস্পিষ্ট হতে বাধ্য না হন কিংবা তদ্দরুন তাদের সংশোধন সংকল্পও ব্যাহত ও পর্যুদস্ত না হয় অথবা তার প্রতি অনীহা ও অনুৎসাহের সঞ্চার না হয়। এ কারণে ইসলামী শরীয়ত ব্যাপারটিকে এভাবে সমাধান করার ব্যবস্থা দিয়েছে। এদের জন্য যাকাতের একটা অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

জনসমষ্টির পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসায় সে লোকেরাও পড়বে যারা সামষ্টিক শরীয়ত সম্মত ভাল কাজের জন্য দায়িত্ব সহকারে কাজ করবে। যেমন, ইয়াতীমদের জন্য প্রতিষ্ঠান, গরীবদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল, নামায প্রতিষ্ঠার জন্য মসজিদ নির্মাণ,মুসলিমদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোন কল্যাণময় বা সামষ্টিক জনসেবামূলক কাজ প্রভৃতি। এসব কাজের মাধ্যমে সমাজের সাধারণ কল্যাণ সাধনের জন্য সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। 'গারিমূন' শব্দ দ্বারা কেবল পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসাকারী লোকদেরই বোঝাবে অন্য কেউ তার মধ্যে শামিল হতে পারবে না, এমন কথা শরীয়ত থেকে জানা যায় না। তারা যদি 'গারিমূন' শব্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নাও হয় তবুও 'কিয়াস'এর সাহায্যে এ বিধান অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। তার অর্থ যে লোক উক্তরূপ সামষ্টিক কল্যাণকর কাজ করার দরুন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়বে, সে ধনী হলেও তাকে যাকাত ফান্ড থেকে তার ঋণশোধ পরিমাণ টাকা অবশ্যই দিতে হবে। প্রথম প্রকারের লোকেরা যখন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণগ্রস্ত হয়েছে এবং তা সত্ত্বেও তাদের সাহায্য করার বৈধতা স্বীকৃত হয়েছে, তাহলে এ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা তো আরো অধিক সাহায্য পাওয়ার যোগ্য। কেননা তারা সামষ্টিক কল্যাণে ঋণগ্রস্ত হয়েছে।[৪১]

ইমাম আবূ দাউদ নবী কারীম স. থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, "যাকাত ধনীলোকের জন্য বৈধ নয়। তবে পাঁচজনের (যদিও তারা ধনী) জন্য বৈধ। পাঁচজন হল : আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধকারী, যাকাতের কর্মচারী, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, কেউ যদি স্বীয় মালের বিনিময়ে তা (যাকাত) ক্রয় করে নেয়, এমন ব্যক্তি যার মিসকীন প্রতিবেশী ছিল, সে মিসকীনকে যাকাত দিয়েছে, অতঃপর সেই মিসকীন ব্যক্তি কোন ধনীকে হাদিয়া হিসেবে দিয়েছে।[৪২]

কুবাইসা ইবনুল মুখারিক আলহিলালী বলেছেন, "আমি একটা বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করলাম। পরে আমি রাসূলে কারীম স. এর কাছে উপস্থিত হয়ে সে ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করলাম। তিনি বললেন, অপেক্ষা কর, আমাদের কাছে যাকাতের মাল আসুক, তখন আমি তোমাকে সেখান থেকে দেয়ার জন্য আদেশ করব। অতঃপর তিনি বললেন, হে কুবাইসা! তিন শ্রেণীর লোকের জন্য ভিক্ষা করা বৈধ। একজন, যার উপর এমন বোঝা চেপেছে যে, তার জন্য ভিক্ষা করা হালাল হয়ে গেছে, যতক্ষণ সে সেই পরিমাণ সম্পদ না পাচ্ছে। তা পেয়ে গেলে সে ভিক্ষা থেকে বিরত থাকবে। দ্বিতীয় এমন ব্যক্তি যে, বড় মুসিবতের বা দুরবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে, তার সমস্ত ধন-সম্পদ নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার জন্য ভিক্ষা বৈধ, যতক্ষণ না সে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাত্রার মালিক হচ্ছে। তৃতীয় ব্যক্তি যে অনশনের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এমনকি তার কওমের লোকদের মধ্য থেকে অন্তত তিনজন বলতে শুরু করেছে যে,অমুক ব্যক্তি না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। এ ব্যক্তির জন্য ভিক্ষা বৈধ, যতক্ষণ না সে তার স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনে ফিরে আসে। হে কুবাইসা! এ তিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো জন্য ভিক্ষা করা ঘুষ ছাড়া কিছুই নয়। এরা ব্যতীত অন্য যে কেউ ভিক্ষা করে সে ঘুষ খায়"।[৪৩]

বস্তুত পারস্পরিক অবস্থার সংশোধন, শান্তি-সম্প্রীতি স্থাপন বা রক্ষা করার জন্য ঋণগ্রস্ত প্রত্যেক ব্যক্তির দিকে সাহায্যের হাত প্রশস্ত করা ইসলামের এক বিশেষ অবদান। বিপদগ্রস্ত ও আঘাতপ্রাপ্ত লোকদেরকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করা,তাদের হাত শক্তভাবে ধরা, যেন তারা পতিত অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াতে পারে, এটা ইসলামের সুমহান অবদান। জিনিসপত্র, পণ্যদ্রব্য, জীবন ইত্যাদির উপর দুর্ঘটনা ও বিপদাপদের ক্ষেত্রে বীমা ব্যবস্থা চালুর কয়েক শতাব্দী পূর্বে দুনিয়া এর সাথে পরিচিত হয়েছে কেবল ইসলামের বদৌলতে। অর্থাৎ ইসলাম এসব বিপদগ্রস্ত লোকদের রক্ষার বাস্তব পদক্ষেপ নিয়েছে। অতএব, যে দরিদ্র ব্যক্তির ক্ষুধার্ত অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেশীদের মধ্য থেকে অন্তত তিনজন লোক সাক্ষ্য দেবে,তারই জন্য দয়াভরা দু'টি বাহু প্রশস্ত করে দেয়ার শিক্ষা একমাত্র ইসলামই দিয়েছে। ইসলামের এ অবদানের উপর আরো বড় অবদান হচ্ছে, যাকাত দেয়ার পরম লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারিত হচ্ছে, গরীব লোকটির জীবনমানে স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেয়া, সুখী জীবনের ব্যবস্থা করা, তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা। যার ফলে সত্যিকার অর্থেই সে নিশ্চিত জীবন যাপন করতে পারবে। কেবল কয়েক মুষ্ঠি খাবার দিয়ে তার মেরুদন্ড খাড়া রাখাই ইসলামের লক্ষ্য নয়।

ইব্‌নুস-সাবীল

অধিকাংশ আলিমগণের মতে 'ইব্‌নুস-সাবীল' বলে বোঝানো হয়েছে সেই মুসাফিরকে, যে এক শহর থেকে অন্য শহরে– এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে

যায়। 'সাবীল' অর্থ পথ, পথিককে 'ইব্‌নুস-সাবীল' বলা হয় এজন্য যে, পথিকের জন্যে পথই হয় অবিচ্ছিন্ন সাথী। কুরআন মাজীদ 'ইবনে-সাবীল' শব্দটি দয়ার পাত্র হিসেবে- সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিকারীরূপে আটবার উল্লেখ করেছে। কুরআনের মক্কী অংশের সূরা আল ইসরায় আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "আত্মীয়-স্বজনকে দেবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করবে না।" [৪৪]সূরা 'আর রুম এ বলা হয়েছে, "এবং আত্মীয়-স্বজনকে দেবে তার হক এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য তা শ্রেয়।"[৪৫] কুরআনের মাদানী সূরাসমূহে 'ইব্‌নুস-সাবীল' কে ফরয কিংবা নফল অর্থব্যয়ের ক্ষেত্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "লোকে কি ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য।"[৪৬]

নিঃস্ব পথিকের ব্যাপারে কুরআনে এতটা গুরুত্বদানের মূল কারণ ও যৌক্তিকতা হচ্ছে, ইসলাম মানুষকে দেশ ভ্রমণ ও বিদেশ গমনের উপদেশ দিয়েছে নানাভাবে ও বিবিধ কারণে। দুনিয়ায় ঘুরে, দেখার ও উৎসাহদানের মূলে কতগুলো কারণ নিহিত রয়েছে–

ক. ভ্রমণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে রিয্‌ক সন্ধানের উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা পৃথিবীর দিগ-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে আহার্য গ্রহণ কর।" [৪৭]

খ ভ্রমণের জন্য ইসলাম উদ্বুদ্ধ করেছে। জ্ঞান-শিক্ষার উদ্দেশ্যে, বিশ্বের অবস্থা অবলোকন এবং সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য। সাধারণভাবে সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর আনুসৃত নীতিসমূহ দেখার উদ্দেশ্যে। বিশেষ করে মানব সমাজের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে। তিনি বলেছেন, 'বল, 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন।" [৪৮]

গ. ইসলাম অপর এক প্রকারের ভ্রমণের আহবান জানায়। তা হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্যে সফর। সর্বপ্রকার বিজাতীয় দখলদারী থেকে দেশের স্বাধীনতার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুসংহত করা, ইসলামী দাওয়াতী কাজের নিরাপত্তা বিধান, ল মজলুমদের নিষ্কৃতি সাধন ও ওয়াদা ভঙ্গকারীদের যথাযথ শাস্তি প্রদান প্রভৃতিই হচ্ছে আল্লাহর পথ। আল্লাহ্ বলেছেন, "অভিযানে বের হয়ে পড়, হালকা অবস্থায় হোক অথবা ভারি অবস্থায় এবং সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। তাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে।" [৪৯]

ঘ. আর এক প্রকারের সফরের প্রতি ইসলাম আহ্বান জানিয়েছে। তা হচ্ছে আল্লাহর একটা সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ইবাদত হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর ঘর পর্যন্ত

যাওয়ার জন্যে। তা ইসলামের একটা অন্যতম 'স্তম্ভ'। আল্লাহ বলেছেন, "মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য।" ৫০

ইসলাম এ সব সফরের জন্য উৎসাহ দিয়েছে। পৃথিবীতে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্যে মুসলমানদের এ সব পরিভ্রমণে উদ্বুদ্ধ করেছে। ইসলামের মহান শিক্ষার বাস্তবায়ন এভাবেই সম্ভবপর হতে পারে। এ ছাড়া আরো কয়েক ধরণের বিশ্বপরিভ্রমণ রয়েছে। ইসলাম এসব সফরে গমনকারী লোকদের প্রতি ও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। আরও বিশেষ করে তাদের প্রতি যারা এ সফরে বের হয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে এবং তার আপন লোকজন ও ধন-মাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ইসলাম সাধারণভাবেই এ সবের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করার নির্দেশ দিয়েছে এবং বিশেষ করে যাকাতের অংশ জনগণের দেয়া সম্পদ থেকে তাদের প্রয়োজন পরিমাণ দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। আর তা করে বিদেশ ভ্রমণের পক্ষে ইসলামের উৎসাহদানকে শক্তিশালী করেছে, শরীয়তসম্মত উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণের কাজটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ভ্রমণকারীদের অপরিচিত পরিমণ্ডলে সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী বানিয়েছে। মুসলিম সমাজের সকল অংশই যে পরস্পর সম্পৃক্ত, দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ তার বাস্তব প্রমাণ উপস্থাপন করেছে। এ সমাজের লোকেরা পরস্পরের হাত ধরাধরি করে চলে, একের বিপদ বা অসুবিধায় অপর লোক বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে দেয়। ইসলামে দেশী-বিদেশীদের মধ্যে কোন পার্থক্যই করার অবকাশ নেই।

মুসাফিরদের আর্থিক অসহায়ত্ব নিরসনে অনন্য ব্যবস্থা

ইসলাম বিদেশী অপরিচিতের মধ্যে নিঃস্ব হয়ে পড়া মুসাফিরদের ব্যাপারে যে গুরুত্ব আরোপ করেছে তা বিশ্ব সমাজ-ব্যবস্থার ইতিহাসে অনন্য দৃষ্টান্তহীন। এ দুনিয়ার অপর কোন মতবাদ, সমাজ-ব্যবস্থা বা কোন বিধানই এরূপ কোন ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি। আসলে এটা এক ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, কোন দেশে বসবাসকারী লোকদের স্থায়ী প্রয়োজন ও অভাব-অনটন দূর করার ব্যবস্থা করেই ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি। বরং ভ্রমণ ও বিদেশ গমন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও কার্যকারণে মানুষ যেসব অভাব ও নিঃস্বতার সম্মুখীন হয়, তার জন্যও সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে ইসলামের এ অবদান সেকালে– যখন পথে-ঘাটে, শহরে বন্দরে– হোটেল, মুসাফিরখানা, বিশ্রামাগার বা হোটেল-রেস্তোরাঁ একালের মত কোথাও ছিল না। কার্যত আমরা দেখতে পাই, ইব্‌নে সা'দ বর্ণনা করেছেন, উমর রা. তাঁর খিলাফত আমলে একটা ঘর নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন এবং তার উপর লিখে দিয়েছিলেন 'দারুদ্দাকীক'– ময়দার ঘর। তার কারণ সে ঘরে ময়দা, আটা, খেজুর,

পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। যেসব নিঃস্ব পথিক ও অতিথি তাঁর নিকট আসত সেসব দিয়ে তার সাহায্য করা হত। অনুরূপভাবে মক্কা ও মদীনার দীর্ঘ পথের মাঝেও উমর রা. অনুরূপ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। নিঃস্ব লোকেরা এখান থেকে যথেষ্ট উপকৃত হত এবং এক স্থান থেকে পানি নিয়ে অপর স্থানে পৌছাতে পারত।[৫১]

উমর ইব্‌নে আব্দুল আযীযের সময়কার ব্যবস্থা সম্পর্কে আবূ উবায়দ বর্ণনা করেছেন, তিনি ইমাম ইবনে শিহাব যুহরীকে যাকাত-সদকা সংক্রান্ত রাসূলে কারীমের বা খুলাফায়ে রাশিদীনের যেসব সুন্নত বা হাদীস মুখস্থ আছে তা তাঁর জন্য লিখে পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে তিনি একখানি দীর্ঘ লিপি লিখে পাঠিয়েছিলেন। তাতে প্রত্যেকটি অংশ আলাদ আলাদা বিভক্ত করে দিয়েছিলেন। এ লিপিখানিতে 'ইব্‌নুস-সাবীল' পর্যায়ে এ কথাটি উদ্ধৃত হয়েছে, ইব্‌নুস সাবীল এর অংশ প্রত্যেক রাস্তায় চলাচলকারী লোকদের সংখ্যানুপাতে বিভক্ত করা হবে, যে কোন নিঃস্ব পথিক- যার কোন আশ্রয় নেই, আশ্রয় দেয়ার মত কোন পরিবারও নেই তাকে খাওয়াতে হবে যতক্ষণ না সে তেমন একটা আশ্রয়স্থল পেয়ে যায় বা তার প্রয়োজন পূর্ণ হয়। প্রত্যেকটি পরিচিত বাড়ি-ঘর নির্ভরযোগ্য লোকের হাতে ন্যস্ত করতে হবে। যেন সে কোন নিঃস্ব পথিক সেখানে উপস্থিত হলে তাকে আশ্রয় ও খাবার দেবে। তার সঙ্গে বাহন থাকলে তার খাবারের ব্যবস্থাও করবে– যতক্ষণ তাদের নিকট রক্ষিত দ্রব্যাদি নিঃশেষ হয়ে না যায়।[৫২]

অভাবগ্রস্ত ও বিপন্ন পথিকের জন্য এরূপ ব্যবস্থা বিশ্বব্যবস্থার কোথাও নেই। ইসলামী ব্যবস্থা ছাড়া আর কোন ব্যবস্থায় এরূপ নিরাপত্তা কোথাও পাওয়া যায় না।

যাকাত দারিদ্র্য নিরসনের শ্রেষ্ঠ উপায়

বিংশ শতাব্দির বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী ড. হাম্মুদাহ্ আব্দালাতি যাকাতকে সমাজ তথা রাষ্ট্রে অভাব-অনটনে নিপতিত জনসমাজের ন্যূনতম চাহিদা মিটানোর উপায় হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, Zakah mitigates to a minimum the sufferings of the needy and poor members of society.It is a most comporting consolation to the less fortunate people, yet it is a loud appeal to everybody to roll up his sleeves and improve his lot.অর্থাৎ যাকাত সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠির দুঃখ-কষ্ট নিরসন করে। এটি অভাবীদের জন্য স্বস্তি ও ভাগ্যোন্নয়নের শ্রেষ্ঠ উপায় বিশেষ।"[৫৩]

যাকাত স্বাভাবিক সমাজ তথা রাষ্ট্র বিনির্মাণে সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পদের যথাযথ বন্টনের উপর অনেকাংশে

নির্ভরশীল। পুঁজিবাদে মুষ্টিমেয় বিত্তশালীর হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত থাকে বলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করে। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সম্পদের উপর রাষ্ট্রের নিরংকুশ কর্তৃত্ব থাকে বিধায় বাস্তবে রাষ্ট্র পরিচালক শক্তির হাতে সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে। এখানেও বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীই যাচ্ছে তাই ভাবে সম্পদকে ভোগ করে। রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষ তথা সর্বস্বান্ত লোকজন তাদের ন্যায্য আর্থিক পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়। তারা একনায়কত্বের নিষ্ঠুর নির্যাতনে দুর্বিসহ দিনাতিপাতে বাধ্য হয়।

যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ইসলাম পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যবর্তী পথকে অবলম্বন করেছে যাতে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত না থেকে সমাজে, রাষ্ট্রে প্রত্যেক ব্যক্তির মাঝে তা আবর্তিত থাকে। আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে বলেছেন, "যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে।"[৫৪] এর পাশাপাশি সমাজতন্ত্রীদের মত ব্যক্তি মালিকানার উচ্ছেদ ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ এতে কর্মস্পৃহা নষ্ট হয়, উৎপাদন হ্রাস পায় এবং একনায়কত্বের জগদ্দল পাথর সর্বহারাদের বুকে চেপে বসে।

ইসলামী রাষ্ট্র ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে বিশেষত অসহায়, নিঃস্ব, নিপীড়িত, বঞ্চিত ও অভাবগ্রস্তদের অভাব নিরসনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাছাড়া বিধবা, পঙ্গু, কর্মক্ষমতাহীন বৃদ্ধ ও অসহায় শিশুদের ভাতা প্রদান ইসলামী রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কর্মক্ষম ও যোগ্য ব্যক্তির কর্মসংস্থানের দায়িত্বও ইসলামী রাষ্ট্রের উপর বর্তায়। ইসলামী রাষ্ট্রের এসব দায়িত্ব পালনের বিশেষ সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাকাতকে বেছে নেয়া হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ হিসেবে যাকাত বণ্টন সংক্রান্ত কাজগুলোকে এভাবে সাজানো যেতে পারে–

১. যাকাত ফান্ড থেকে দুস্থ নারী-পুরুষ, গরীব, পঙ্গু, অক্ষম, বৃদ্ধ, ইয়াতীম এবং এ ধরনের অসহায় ও অভাবী লোকদের নিয়মিত স্থায়ী ভাতার ব্যবস্থাকরণ যাতে তারা সবাই মৌলিক চাহিদা (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা) পূরণে সক্ষম হয়।

২. কর্মে সক্ষম অভাবী জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন করতে হবে যাতে তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে জীবন-যাপন করতে পারে।

৩. পথিক ও প্রবাসীদের সার্বিক নিরাপত্তার নিমিত্তে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. সঙ্গতকারণ সাপেক্ষে ঋণী ব্যক্তিদের ঋণমুক্ত করে স্বাভাবিক জীবন-যাপনে সক্ষম করে তোলা।

৫. দরিদ্র লোকদের পুত্র কন্যার শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

৬. গরীব ও সর্বহারাদের পরিবার-পরিজনদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সেবাসদন প্রতিষ্ঠা করা।

৭. গরীব অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত বৃত্তি বা অনুদানের ব্যবস্থা করা।

৮. ইসলামী জীবন বিধান প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৯. বেকারদের নিয়মিত ভাতা প্রদান এবং তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

১০. বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সাহায্য পুনর্বাসনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।[৫৫]

ইসলাম হল দীনে ফিতরাত বা স্বভাবজাত জীবন বিধান। এর বিধি-বিধান বা নিয়ম-কানুন শুধু তাত্ত্বিক নয় বরং মুহাম্মদ স. এর জীবনাচার ও তাঁর সংগীদের কাজ-কর্মে তা প্রোজ্জল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমাজের দরিদ্র ও অসহায় শ্রেণীর 'দারিদ্র্য নিরসন' নিশ্চিত করার জন্য যাকাতের বিধান নাযিল করেছেন। মুহাম্মদ স. তাঁর নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে তাঁর শিক্ষায় আলোকিত হয়ে ইসলামের প্রথম খলীফা আবূ বকর রা. বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম নিঃস্ব, বঞ্চিত, অসহায়, সর্বস্বান্তদের অধিকার রক্ষায় তলোয়ার হাতে নিয়ে যুদ্ধ করে শোষক শ্রেণীকে পরাস্ত করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। গরীবের হক যাকাত আদায়ে তথা তাদের দারিদ্র্য নিরসনে তিনি নিরলস কাজ করে গেছেন এবং তাতে তিনি শতভাগ সফল হয়েছেন। বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ইউসুফ আল-কারযাভী এ সর্ম্পকে বলেন, "সম্ভবত ইতিহাসে আবূ বকর রা. পরিচালিত ইসলামী রাষ্ট্রই প্রথম রাষ্ট্র যে ফকীর, মিসকীন ও সমাজের দুর্বল শ্রেণীর অধিকার আদায়ের ব্যাপারে লড়াই করে। সমাজের শক্তিমান লোকেরা দীর্ঘদিন ধরে এদেরকে শোষণ করে আসছিল। কিন্তু কেউই তাদের পক্ষ হয়ে এর প্রতিকার করেনি। শক্তিমানদের কাতার ছেড়ে কেউই তাদের কাতারে এসে দাঁড়ায়নি।"[৫৬]

আবূ বকর রা. সাহাবায়ে কিরাম রা. কে সাথে নিয়ে এই শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গরীবদের হক প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর দৃঢ় পদক্ষেপের কারণে যাকাত দারিদ্র্য-বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখে। দ্বিতীয় খলীফা উমর রা. এই অসহায় শ্রেণীর অবস্থা উন্নয়নে নিজে সারাদিন প্রশাসনিক কাজ করে রাতের বেলা নিদ্রা ত্যাগ করে ঘুরে বেড়াতেন। নিজে আটার বস্তা কাঁধে নিয়ে অভাবী পরিবারে পৌছে দিতেন।

পরবর্তীতে পঞ্চম খলীফা উমর ইব্‌নে আব্দুল আযীযের সময় অবস্থা এমন হল যে, যাকাত নেয়ার মত আর কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না। এই প্রসংগে ড. হাম্মুদাহ আবদালাতি বলেন : It is authentically reported that there were times in the history of Islamic administration when there was no person eligible to receive Zakah; every subject Muslim, Christian and Jew of the vast Islamic empire had enough to satisfy his needs and the rulers had to deposit the Zakah collections in the public treasury. অর্থাৎ "এটি প্রমাণিত সত্য যে, ইসলামী শাসনামলের ইতিহাসে এমন সময় ছিল, যখন যাকাত গ্রহণ করার মত লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রতিটি নাগরিক মুসলিম, খৃস্টান, ইয়াহূদী তার প্রয়োজন পূরণ ও অভাব মোচনে সক্ষম ছিল। আর শাসকবর্গকে যাকাত বাবদ উত্তোলিত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা রাখতে হতো।"

উপসংহার

তৃতীয় বিশ্বের মুসলিমদেশসমূহে বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের অনেক মুসলিম জনপদে অসংখ্য মানুষ অর্ধাহারে-অনাহারে, গৃহহীন-বস্ত্রহীন অবস্থায় মানবেতর জীবন যাপন করছে। এদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য বাংলাদেশসহ গোটা মুসলিম বিশ্ব যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করে এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা সুষ্ঠু বন্টনের ব্যবস্থা করে তাহলে খুব স্বল্প সময়ে উপরোল্লিখিত জনপদ থেকে দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব। জাতিসংঘ ঘোষিত এমডিজি বা 'মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল' এর অন্যতম এজেন্ডা হল দারিদ্র্য মুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলা। যাকাত ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হলে এই গোলে পৌঁছা সহজেই সম্ভব হবে। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মানবতাকে মুক্ত করে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যাকাত এক বলিষ্ঠ হাতিয়ার হিসাবে কাজ করতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

১. মাদকুর, ড. ইবরাহীম, *আল-মুজামুল ওয়াসীত*, দেওবন্দ, কুতুবখানা হোসাইনিয়া : খ্রি.১৯৯৬, ইউ.পি., পৃ.৩৯৬

২. আল-কারযাভী, ড. ইউসুফ, *ফিকহুয যাকাত*, বৈরূত : *মুআসসাসাতুর রিসালাহ*, খ্রি.২০০০. পৃ.৩৮

৩. আল-কুরআন, ২:৩৫

يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما

৪. আল-কুরআন, ৭:৩১

كلوا واشربوا ولا تسرفوا

[৫]. আল-কুরআন, ৭:৩২

قل من حرم زينه الله التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين أمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامه

[৬]. *ফিকহুয যাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭২

ثلاث من السعادة المرأة تراها فتعجبك وتغيب عنها فتامنها على نفسها ومالك والدابة تكون وطيئة فتلحقك باصحابك والدار تكون كثيرة المرافق

[৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭২-৭৩

أربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني وأربع من الشقاء: الجار السوء والمرأة السوء والمركب السوء والمسكن الضيق

[৮]. আল-কুরআন, ৯৩:৮

ووجدك عائلا فاغنى

[৯]. আল-কুরআন, ৮:২৬

فاوكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون

[১০]. মুসলিম, ইমাম, *আসসহীহ্*, অধ্যায় : আযযিকর, অনুচ্ছেদ : ফিলআদইয়া, আল-কুতুবুস সিত্তা, রিয়াদ : দারুস সালাম, খ্রি.২০০০, পৃ. ১১৫০

اللهم إنى أسئلك الهدى والتقى والعفاف والغنى

[১১]. মুসলিম, ইমাম, *আস্সহীহ্*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : বায়ানু আন্না ইসমাস সাদাকাহ, হাদীস নং-৫২

ذهب أهل الدثور بالأجور

[১২]. আল-কুরআন, ১৬:৬৭

من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة

[১৩]. আল-কুরআন, ১৬:১১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩৮

وضرب الله مثلا قرية أمنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون-

[১৪]. আল-কারযাভী, ড. ইউসুফ, *মাশকালাতুল ফাকরী ওয়া কাইফা আলাজাহাল ইসলাম*, আল-কাহেরা : মাকতাবাতু ওয়াহব খ্রি.২০০৩, *পৃ.* ১২

[১৫]. আল-কুরআন, ১৭:৭০

ولقد كرمنا بنى ادم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا-

[১৬]. কুতুব, সাইয়্যেদ, *আল-আদালাতুল ইজতেমাইয়া ফিল ইসলাম*, বৈরূত : দারুশ-শুরূক, খ্রি. ১৯৮৫, *পৃ.* ১৩২-১৩৩

[১৭]. মুসলিম, ইমাম, *আসসহীহ্, অধ্যায় : আননিকাহ*, অনুচ্ছেদ : ইযা কব্বাল খাতিবু ..., আল-কুতুবুস সিত্তা, রিয়াদ : দারুস সালাম, খ্রি.২০০২, পৃ. ৪৪৫

كونوا عباد الله إخوانا

[১৮]. মুসলিম, ইমাম, *আস্‌সহীহ্‌, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াস সিলাতু ওয়াল আদাব, অনুচ্ছেদ : তাহরীমুয যুলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২৯*

المسلم اخو المسلم

[১৯]. মুসলিম, ইমাম, *আস্‌সহীহ্‌*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : আদ-দালীলু আলা আন্না মিন খিসালিল ঈমান..., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৮। হাদীস নং-৭১

لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

[২০]. আল-কুরআন, ৯:৬০

[২১]. বুখারী, ইমাম, *আসসহীহ,* অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : উজুবুয় যাকাত, আলকুতুবুস সিত্তা, রিয়াদ : দারুস সালাম, খ্রি.২০০২ পৃ. ১০৯

أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

[২২]. ইবনে কাছীর, ইমাম, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম,* আল-কাহেরা : দারুত তাক্বওয়া লিত-তুরাছি, তা. বি. খ.১, পৃ. ৩২৪

ليس المسكين الذى ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذى يتعفف اقرأوا إن شئتم (لا يسألون الناس الحافا؛

[২৩]. প্রাগুক্ত

[২৪]. আল-কুরআন, ২:২৭৩

للفقراء الذين احصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيما هم لا يسألون الناس إلحافا

[২৫]. আল-কাসিম, আবূ উবায়দ, *কিতাবুল আমওয়াল,* ইসলামাবাদ : ইদারাতু তাহকীকাতিল ইসলামী, খ্রি.১৯৯৬, পৃ.৫৫৬

[২৬]. আল-মুনযেরী, আবূ মুহাম্মদ যাকিউদ্দীন, *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, বাংলা অনু, মাওঃ মুহাম্মদ সাঈদুল হক, অধ্যায় : আস-সাদাকাহ, অনুচ্ছেদ : আত-তারহীবু মিনাল মাসআলাহ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খ্রি:২০০৩, খ.১ পৃ. ৫৫৭

لا تحل المسئلة إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسئلة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتحت ماله فحلت له المسئلة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه: قد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسئلة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسئلة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا

[২৭]. *ফিকহুয যাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৪-৫৬৫

[২৮]. আল কাসিম, আবূ উবায়দ, *কিতাবুল আমওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ, ৫৬৫

إذا أعطيتم فاغنوا

[২৯]. প্রাগুক্ত

كرروا عليهم الصدقة وان راح علي أحدهم مائة من الإبل

[৩০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৫-৫৬৬

[৩১]. প্রাগুক্ত

إذا أعطى الرجل زكاة ماله أهل بيت من المسلمين فجبرهم فهو أحب إليّ

[৩২]. প্রাগুক্ত,

[৩৩]. প্রাগুক্ত,

[৩৪]. আবু দাউদ, ইমাম, *আসসুনান*, অধ্যায় : আ-তিব্ব, অনুচ্ছেদ : আর-রাজুলু ইয়া তাদায়া, আল-কুতুবুস সিত্তা, রিয়াদ : দারুস সালাম, খ্রি.২০০০, পৃ. ১৫১৭

تداوُوا يا عباد الله فان الله لم يضع داء الا وضع له داواء-

[৩৫]. আল-কুরআন, ২:১৯৫

ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه

[৩৬]. আল-কুরআন, ৪:২৯

ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما

[৩৭]. ইমাম, বুখারী, *আস্‌সহীহ্*, অধ্যায় : আল-মাযালিম, অনুচ্ছেদ : লা ইয়াযলিমুল মুসলিম... প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه

[৩৮]. *কিতাবুল আমওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৯

[৩৯]. *ফিকহুয যাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৮

[৪০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৩

فعن مجاهد قال: ثلاثة من الغارمين :رجل ذهب السيل بماله ورجل أصابه حريق فذهب بماله ورجل له عيال وليس له مال فهو يذان وينفق على عياله

[৪১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩০-৩১

[৪২]. আবু দাউদ, ইমাম, *আসসুনান*, অধ্যায় : আযযাকাত, অনুচ্ছেদ : মান ইয়াজুযু লাহু আখজুযু সাদাকাহ ..., *আল-কুতুবুসসিত্তা*, রিয়াদ : দারুস সালাম, খ্রি. ২০০০, পৃ. ১৩৪৪

لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لغاز فى سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل إشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغنى

[৪৩]. আল মুনযিরী, আত-*তারগীব ওয়াত তারহীব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭০

تحملت حمالة فأتيت رسول الله سلى الله عليه وسلم أسئله فيها فقال : أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال: يا قبيصة: االمسئلة لا تحل إلا لإحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسئلة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتحت ماله فحلت له المسئلة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه: قد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسئلة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسئلة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا

[৪৪]. আল-কুরআন, ১৭:২৬

وات ذا القربى حقه والمسكين ابن السبيل ولا تبذر تبذيرا-

[৪৫]. আল-কুরআন, ৩০:৩৮

فات ذا القرتى حقه والمسكين وابن السبيل ذالك خير للذين يريدون وجه الله-

[৪৬]. আল-কুরআন, ২:২১৫

يسئلونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خيرفللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل-

[৪৭]. আল-কুরআন, ৬৭:১৫

فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه-

[৪৮]. আল-কুরআন, ২৯:২০

قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق

[৪৯]. আল-কুরআন, ৯:৪১

انفروا خفافا وثقالا و جاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله- ذالكم خير لكم ان كنتم تعلمون

[৫০]. আল-কুরআন, ৩:৯৭

ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا-

[৫১]. ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাত আল-কুবরা,* বৈরূত : দারুস-সাদের, খ্রি.১৯৫৭, খ., পৃ.-২৮৩

[৫২]. *কিতাবুল আমওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮০

[53]. Abdalati, Hammudah, *Islam in Focus,* Islamic Teaching Center, p. 96

[৫৪]. আল-কুরআন, ৫৯:৭

كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم

[৫৫]. শরীফ হোসাইন, অধ্যাপক মুহাম্মদ, *যাকাত কি ও কেন,* ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, খ্রি. ১৯৯৫, পৃ.১৯-২০

[৫৬]. *ফিকহুয যাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

لعل الدولة الإسلامية فى عهد أبى بكر هى أول دولة فيما يعرف التاريخ تقاتل من أجل الفقراء والمساكين والفئات الضعيفة فى المجتمع التى طالما أكلتها الطبقات القوية ولم تجد عونا لدى الحكا م الذين كانوا يقفون دوما فى صف الأغنياء والأقوياء

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ঃ ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৪, পৃষ্ঠা ৯৭-১১২

মুদারাবা কারবারের শরয়ী বিধান : বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে এর প্রয়োগ

ড. মুহাঃ কামরুজ্জামান*

[সারসংক্ষেপ : ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মুদারাবা কারবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারী বিনিয়োগ ব্যবস্থা। মূলতঃ মুদারাবা ব্যবস্থায় একপক্ষ শ্রম আর অন্যপক্ষ অর্থ যোগান দেয় এবং শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত লাভ উভয়পক্ষের মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি অনুযায়ী বন্টিত হয়। আর যদি লাভ না হয়ে লোকসান হয় তাহলে অর্থের যোগানদাতাকেই তার দায়বহন করতে হয়। এ নিয়ম অনুযায়ী নবুয়তের পূর্বে মহানবী স. বিবি খাদীজা রা. এর অর্থ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতেন। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে তাতে সম্পদের সুষম বণ্টন, শোষণের অবসান, ধন বৈষম্যের অপনোদন এবং আর্থ-সামাজিক জীবনে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব। কিন্তু সুদের সর্বগ্রাসী প্রকোপ ও ব্যক্তিচরিত্রের দৈন্যতার কারণে আধুনিক বিশ্বের ব্যবসা ব্যবস্থায় এ পদ্ধতি অনুপস্থিত অথচ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুদারাবা পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অত্র প্রবন্ধে মুদারাবা কারবারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হল।]

মুদারাবার সংজ্ঞা

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মুদারাবা مضاربة কারবার অংশীদারী পদ্ধতির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এ ব্যবস্থায় ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই কেবলমাত্র পরস্পর লাভে অংশগ্রহণ করে, লোকসানের ক্ষেত্রে এক পক্ষ তথা শ্রম বিনিয়োগকারী কোন ধরনের অর্থনৈতিক লোকসানে অংশগ্রহণ করে না। এ ক্ষেত্রে তার শ্রম বিনিয়োগ সম্পূর্ণ লোকসান হয়।

আভিধানিক অর্থ

مضاربة শব্দটি আরবী الضرب ক্রিয়ামূল থেকে উদ্গত, যার অর্থ–

---

*সহযোগী অধ্যাপক, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

(১) আঘাত করা, জমিনে পদাঘাত করা, যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, "আর মূসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, স্বীয় লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর। অতঃপর তা থেকে বারটি প্রস্রবণ বেরিয়ে এল[১]।"

(২) আরোপিত হওয়া, পুঞ্জিভূত হওয়া, যেমন কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে, "আর তাদের উপর লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা আরোপিত হল। তারা আল্লাহর রোষানলে পড়ে ঘুরতে থাকল[২]।"

(৩) ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন, المضاربة শব্দটি আরবী الضرب ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত। অর্থ– জমিনে ভ্রমণ করা, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বিচরণ করা, চলাফেরা করা ইত্যাদি[৩]। যেমন কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশে-বিদেশে ভ্রমণে যাবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত হবে[৪]।"

- **ব্যবসা পরিচালনাকারীকে যেহেতু ব্যবসায়িক কাজে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত করতে হয় তাই ইসলামী আইনবিদগণ এ কারবারের নাম দিয়েছেন মুদারাবা।**
- আবার ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থে مضاربة কে 'ক্বিরাদ' (قراض) বলা হয়েছে, যার অর্থ–ধারে ব্যবসা করা, আর এর পুঁজির যোগানদাতা হল 'মুক্বারিদ (مقارض)।

পারিভাষিক অর্থ

(১) ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন, "মুদারাবা হল, এমন দ্বিপক্ষীয় চুক্তির নাম যেখানে এক পক্ষ মূলধন দিবে এবং অপর পক্ষ তা দ্বারা এ শর্তে ব্যবসা করবে যে, অর্জিত মুনাফা উভয়ের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বন্টিত হবে[৫]।"

(২) মিনহাজুল মুসলিম গ্রন্থকার বলেন, "মুদারাবা হল এমন চুক্তির নাম যেখানে দু'টি পক্ষ থাকে। তাদের এক পক্ষ মূলধন যোগান দেয় এবং অন্য পক্ষ তা ব্যবসায় বিনিয়োগ করে। আর অর্জিত মুনাফায় তাদের উভয়ের অংশ থাকে। তবে লাভের এ অংশটি সব সময় নির্দিষ্ট থাকে না; লভ্যাংশ ওঠা-নামা করে। অর্থাৎ এখানে দু'পক্ষের প্রত্যেকেরই একটি অংশ থাকে। যেমন, এক-তৃতীয়াংশ বা দুই তৃতীয়াংশ। আর এ ব্যাপারে মুসলিম পণ্ডিতগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন[৬]।"

(৩) ফাতাওয়া ও মাসাইল গ্রন্থে বলা হয়েছে, "পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে যে সব ব্যবসায়-বাণিজ্য করা হয় এর মধ্যে একটি হল মুদারাবা। আর এটা হল এমন ব্যবসা যার মধ্যে একপক্ষ মূলধনের ব্যবস্থা করে এবং অন্যপক্ষ এ মূলধন দিয়ে

ব্যবসা করে। এ ব্যবসায় যা মুনাফা হয় তা উভয় পক্ষের মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি অনুযায়ী বণ্টন করা হয়। এ পদ্ধতি অবলম্বন করে ব্যবসা করা হলে পুঁজি একই স্থানে পুঞ্জিভূত হয় না বিধায় সকলেই উপকৃত হতে পারে[৭]।"

(৪) মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বলেন, "মুদারাবা কারবারে দু'টি পক্ষ থাকে। একপক্ষ অর্থ সরবরাহ করে এবং অন্য পক্ষ তার সময়, শ্রম, মেধা, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার যোগান দেয়। অর্থ সরবরাহকারীকে 'সাহিবুল মাল' এবং সময়, শ্রম, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা যোগানদাতাকে 'মুদারিব' বলে। 'মুদারাবা' মূলত এক ধরনের অংশীদারী চুক্তি। 'সাহিবুল মাল' এ চুক্তি অনুযায়ী মুদারিবকে তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যবসায়িক কারবার পরিচালনার জন্য মূলধন সরবরাহ করে [৮]।"

(৫) Accounting Auditing and Organization for Islamic Financial Institutions, 2004-2005, Statement of the Standard এ বলা হয়েছে, "Mudaraba is a partnership in profit whereby one party provides capital *(rab al maal)* and the other party provides labour (mudarib)" [9].

সুতরাং মুদারাবা হচ্ছে এক প্রকার অংশীদারী কারবার যা চুক্তির ভিত্তিতে মুনাফায় অংশীদারিত্ব স্থাপিত হয়। এ পদ্ধতিতে একপক্ষ পুঁজির যোগান দেয় এবং অন্যপক্ষ ঐ পুঁজি ব্যবহার করে স্বীয় শ্রম, সময় ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সরাসরি ব্যবসা পরিচালনা করে এবং চুক্তির ভিত্তিতে মুনাফায় অংশীদারিত্ব লাভ করে। এভাবে একপক্ষের মূলধন এবং অন্যপক্ষের দৈহিক শ্রম, মেধা ও বুদ্ধির সমন্বয়ে যে ব্যবসা পরিচালিত হয় তাকে মুদারাবা বলা হয়। মুদারাবা ব্যবসায় যে পক্ষ পুঁজির যোগান দেয় তাকে 'রাব্বুল মাল' বা 'সাহিবুল মাল' বলা হয় এবং শ্রমদানকারীকে 'মুদারিব' বলা হয়।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় এরূপ ব্যবসার গুরুত্ব অনেক বেশী। কেমনা আমাদের দেশে এমন অনেক সম্পদশালী মানুষ আছেন যারা ব্যবসা সম্পর্কে অজ্ঞ। আবার এমন অনেক লোকও আছেন যাদের অর্থ-সম্পদ নেই কিন্তু সততা, বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতা আছে। এমতাবস্থায় বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ যদি বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ বিত্তহীন ব্যক্তিদের সাথে একত্র হয়ে যৌথভাবে ব্যবসা করে তাহলে এর দ্বারা উভয়েই উপকৃত হতে পারে। সাথে সাথে সমাজ এবং দেশও উপকৃত হতে পারে।

ইসলামী শরীয়তে মুদারাবা কারবার

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা একটা বৈধ কারবার। কুরআন, হাদীস এবং ইজমা-এর ভিত্তিতে ইমামগণ মুদারাবা কারবারকে বৈধ বলে দলীল পেশ করেছেন। নিম্নে এ বিষয়ের বর্ণনা প্রদান করা হল–

- কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, "কিছু কিছু লোক আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে পৃথিবীতে বিচরণ করবে[১০]।"
- আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন, "যখন নামায সমাপ্ত হয় তখন তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও [১১]।"
- অন্যত্র আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন, অর্থাৎ "তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের যে অনুগ্রহ দান করেছেন তা অনুসন্ধান করতে তোমাদের কোন অসুবিধা নেই[১২]।"

উপরোল্লিখিত আয়াতগুলো মুদারাবা কারবারের নির্দেশক হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। কেননা আয়াতে ব্যবহৃত الضرب অর্থ– জমিনে বিচরণ করা। আর এর অর্থ হল, উদ্যোক্তা মূলধন নিয়ে সুবিধামত ব্যবসা করে এবং লাভে ক্রয়–বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করে[১৩]।

সাধারণ মুদারাবা সম্পর্কে হাদীসের বক্তব্য নিম্নরূপ–

(১) ইমাম মালিক র. তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে বলেন, "মুদারাবা কারবার এভাবে বৈধ, কেউ কারো নিকট হতে এ শর্তে টাকা নিন যে, সে শ্রম দেবে। ক্ষতি হলে সে দায়ী থাকবে না। মূলধন যদি পর্যাপ্ত হয় তাহলে সফরে খাওয়া-দাওয়া, বহন খরচ ও অন্যান্য বৈধ খরচ ঐ অর্থ থেকে নিয়ম মাফিক ব্যয়িত হবে। আর অর্থ গ্রহণকারীর যদি সফরের প্রয়োজন না হয় তাহলে মূলধন থেকে ব্যয় করতে পারবে না[১৪]।"

(২) তিনি আরো বলেন, "যায়েদ ইবনে আসলাম র. তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, উমর রা.-এর দুই পুত্র আব্দুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহ জিহাদের উদ্দেশ্যে এক কাফেলার সাথে ইরাক গমন করেন। ফিরবার সময় তাঁরা বসরার আমীর আবূ মূসা আশআরী রা.-এর নিকট গেলেন। তিনি তাঁদের স্বাগত জানিয়ে বললেন, যদি আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারতাম তাহলে অবশ্যই করতাম। ঠিক আছে আমার নিকট আল্লাহর কিছু সম্পদ আছে, এটা আমি আমীরুল মু'মিনীনের নিকট পাঠানোর ইচ্ছা করছি এবং আমি তা তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা

তদ্বারা ইরাক থেকে কোন বস্তু ক্রয় করে নিও। অতঃপর তা মদীনায় বিক্রয় করে কিছু মুনাফা অর্জন করতে পার। তারা বললেন, আমরাও তাই চাচ্ছি। পরে আবূ মূসা তা-ই করলেন এবং উমর রা. কে এ মর্মে লিখে জানালেন যে, তাঁদের নিকট হতে মূলধন নিয়ে নিবেন। তাঁরা মদীনায় পৌঁছে ঐ বস্তু বিক্রয় করে অনেক মুনাফা অর্জন করলেন এবং মূল অর্থ নিয়ে উমর রা.-এর নিকট উপস্থিত হলেন। অতঃপর তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আবূ মূসা কি প্রত্যেক সৈনিককে এত অর্থ ঋণ দিয়েছেন? জবাবে তাঁরা বললেন, না। উমর রা. বললেন, তিনি তোমাদেরকে আমীরুল মু'মিনীনের পুত্র হিসেবে এ অর্থ দিয়েছেন। তোমরা মূল অর্থ ও মুনাফা উভয়টাই আদায় কর। একথা শুনে আব্দুল্লাহ চুপ হয়ে গেলেন। কিন্তু উবায়দুল্লাহ বললেন, আমীরুল মু'মিনীন, আপনার এরূপ করা উচিত হবে না। কারণ যদি এ অর্থ নষ্ট কিংবা ক্ষতি হয়ে যেত, তবে তার জন্য জিম্মদার হতাম আমরা। উমর রা. বললেন, না তোমরা সবটুকুই দিয়ে দাও। আব্দুল্লাহ চুপই থাকলেন কিন্তু উবায়দুল্লাহ তার উক্তির পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন উমর রা.-এর উপদেষ্টা আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রা. বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! এ ব্যাপারকে বাইয়ে-মুদারাবা সাব্যস্ত করতে পারেন, এটাই উত্তম হবে। উমর রা. বললেন, এটাই সাব্যস্ত করলাম। পরে তিনি মূলধন এবং অর্ধেক মুনাফা গ্রহণ করলেন। আর বাকী অর্ধেক মুনাফা গ্রহণ করলেন আব্দুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহ[১৫]।"

(৩) এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে আরো বলা হয়েছে, "আলা ইবনে আবদুর রহমান তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, উসমান ইবনে আফফান রা. তাকে কিরায চুক্তিতে এই মর্মে অর্থ প্রদান করেছিলেন যে, সে শ্রম দেবে আর মুনাফা উভয়ে ভাগ করে নিবে[১৬]।"

(৪) হাদীস শরীফে আরো এসেছে, "সালেহ ইবনে সুহাইব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : তিন বস্তুর মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। আর তা হল : (১) নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক বিক্রি করা, (২) ভাগে বা শরীকানায় ব্যবসা করা এবং (৩) বিক্রির উদ্দেশ্য ব্যতীত শুধু ঘরের কাজে গমের সাথে যব মেশানো[১৭]।" উল্লিখিত হাদীসে ব্যবহৃত مقارضة শব্দটি مضاربة অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা مضاربة এর এক অর্থ قراض বা ধার দেয়া কিংবা পুঁজি দিয়ে ভাগে কাজ করা, যাকে مضاربة বা قراض ও বলে।

তাই সাহাবায়ে কিরামের অনেকেই এ পদ্ধতিতে ব্যবসা বাণিজ্য করেছেন[১৮]।

মুদারাবা কারবারের ব্যাপারে সাহাবীদের ইজমা'

(৫) ড. ওয়াহ্‌বা যুহায়লী তাঁর 'আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "সাহাবায়ে কিরামের মধ্য হতে একটি জামায়াত ইয়াতিমের সম্পদ مضاربة -এর মাধ্যমে ব্যবসায়-বিনিয়োগ করেছেন এবং তাদের একজনও এটাকে অস্বীকার করেননি [১৯]।"

(৬) এছাড়া নবুয়ত লাভের পূর্বে রসূলুল্লাহ স. খাদীজা রা. এর সম্পদ দ্বারা এরূপ অংশীদারী ব্যবসা করেছিলেন। খাদীজা রা. অর্থ যোগান দিতেন আর নবী করীম স. সেই অর্থ নিয়ে ব্যবসায়িক কাজে সিরিয়া যেতেন এবং সেই অর্থ ব্যবসায়ে খাটাতেন। এভাবে খাদীজা রা. এর অর্থ এবং নবী করীম স. এর শ্রম প্রদানের মাধ্যমে যে মুনাফা অর্জিত হত তা উভয়ের মাঝে নির্দিষ্ট হারে বণ্টিত হতো। নবুয়ত লাভের পরও তিনি এ পদ্ধতিতে ব্যবসা করার সম্মতি প্রদান করেছেন।

মুদারাবার প্রকারভেদ

মুদারাবা দুই ভাগে বিভক্ত। যথাঃ (১) মুদারাবা মুতলাক (২) মুদারাবা মুকায়্যাদ

(১) মুদারাবা মুতলাক

"মুদারাবা মুতলাক অর্থ– শর্তবিহীন মুদারাবা চুক্তি। যেমন কোন ব্যক্তি কাউকে কোন শর্ত ব্যতীত মাল প্রদান করে বলল, আমি তোমাকে এই মাল মুদারাবা ভিত্তিতে প্রদান করলাম। তা দ্বারা যা লাভ হবে তা এমন এমনভাবে আমাদের মধ্যে বন্টিত হবে[২০]।" অর্থাৎ যে চুক্তিতে ব্যবসার প্রকৃতি, পরিধি, ধরন, সময়সীমা, ব্যবসায়ের স্থান, অংশীদারদের সংখ্যা ইত্যাদি নির্দিষ্ট থাকে না তাকে মুদারাবা মুতলাক বা শর্তবিহীন মুদারাবা বলা হয়। এ পদ্ধতিতে অর্থ জমাকারীকে صاحب المال তথা 'পুঁজির মালিক' বলা হয়। অপরপক্ষে অর্থ গ্রহণকারী তথা প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় 'মুদারিব'। এক্ষেত্রে মুদারিব যা ভাল মনে করে সেভাবে ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে। যে কোন বৈধ পণ্যের স্বাধীনভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে। ব্যবসা পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে দেশ ভ্রমণ, অফিস ভাড়া করা ইত্যাদি বিষয়ে মুদারিব পূর্ণ স্বাধীন থাকেন। তবে এক্ষেত্রে মুদারিব পুঁজির মালিকের কাছ থেকে পূর্বানুমতি নিয়ে থাকেন।

(২) মুদারাবা মুকায়্যাদ

"মুদারাবা মুকায়্যাদ হল শর্তযুক্ত মুদারাবা। অর্থাৎ যে চুক্তিতে কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে এই শর্তে অর্থ দেয় যে, সে নির্দিষ্ট শহর, নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট

ব্যক্তির সাথে মুদারাবা ভিত্তিতে ব্যবসা করবে[২১]।" অর্থাৎ যে চুক্তিতে ব্যবসার প্রকৃতি, পরিধি, ধরন, সময়সীমা, ব্যবসায়ের স্থান, অংশীদারদের সংখ্যা ইত্যাদি সকল বিষয়ই নির্দিষ্ট থাকে কিংবা যে কোন একটি বিষয় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় তাকে মুদারাবা মুকায়্যাদ তথা শর্তযুক্ত মুদারাবা বলা হয়। এ পদ্ধতিতে মুদারিবের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে না। চুক্তি অনুযায়ী মুদারিবকে মূলধন যোগানদাতার নির্দেশ মোতাবেক ব্যবসা পরিচালনা করতে হয়।

মুদারাবা কারবারের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মুদারাবা কারবারে দু'টি পক্ষ থাকে।
- লাভ হলে দু'পক্ষের মাঝে পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি অনুযায়ী বণ্টিত হয়।
- লোকসান হলে সাহিবুল মাল তা বহন করে এবং মুদারিবের শ্রম বৃথা যায়।
- মুদারিব ও সাহিবুল মাল উভয়ের মাঝে ব্যবসায়ের মুনাফার অংশ যেমন ৩০%, ৪০% ইত্যাদি হারে পূর্বেই নির্ধারিত হবে।
- মুনাফার কোন পরিমাণ নির্ধারিত হবে না, যেমন– ৩০ টাকা, ৪০ টাকা ইত্যাদি। তাহলে এটা সুদ হবে।
- প্রতিষ্ঠান 'সাহিবুল মাল' হিসাবে মূলধন যোগায় এবং স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তা মুদারিব হিসাবে সে মূলধন ব্যবসায় খাটায়।
- প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেন উদ্যোক্তা।
- প্রতিষ্ঠান প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ না করলেও চুক্তির শর্তানুসারে তার তত্ত্বাবধান, পরামর্শ ও উপদেশ প্রদানের অধিকার সংরক্ষণ করে।
- চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মুনাফা প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তার মধ্যে ভাগাভাগি হয়।
- উদ্যোক্তা বা তার কর্মচারী বা প্রতিনিধি কর্তৃক শর্ত লঙ্ঘন, অবহেলা, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, অব্যবস্থা বা বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে কোন লোকসান হয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান উদ্যোক্তার নিকট থেকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেয়ার অধিকার রাখে।
- উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন সূত্র থেকে উক্ত ব্যবসায়ের জন্য মূলধন সংগ্রহ করতে পারেন না। এরূপ ক্ষেত্রে সংগৃহীত উক্ত মূলধন উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত ঋণ হিসেবে গণ্য হয়।
- মুদারিব বা বিনিয়োগগ্রহীতা মুনাফার নির্ধারিত অংশের বাইরে পারিশ্রমিক বা ভাতা নিতে পারেন না; এমনকি কারবার থেকে নিজস্ব কোন খরচও গ্রহণ

করতে পারেন না। তবে কারবারের সাথে সংশ্লিষ্ট স্বাভাবিক ও অপরিহার্য খরচ নিতে পারেন।

- চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে লাভ-লোকসান হিসাব ও বন্টন চূড়ান্ত করে কারবার সমাপ্ত করতে হয়।
- মেয়াদের মধ্যে নির্ধারিত সময়ে, যেমন- ৩ মাস, ৬ মাস, ১ বছর পর পর হিসাব করে লাভ-লোকসান বন্টন করা যেতে পারে। তবে তা অগ্রীম হিসেবে গণ্য হয়। চূড়ান্ত হিসাব মেয়াদ পূর্ণ হলেই করতে হয় এবং তখন এরূপ অগ্রিম সমন্বয় করতে হয়।

মুদারাবার রুকন

মুদারাবার রুকন দু'টি। যথা ঃ (১) ইজাব অর্থাৎ পুঁজির যোগানদাতা কোন ব্যক্তিকে প্রস্তাব করল, তুমি আমার নিকট হতে এই ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা গ্রহণ কর এবং তা ব্যবসায়িক কারবারে বিনিয়োগ কর। অত:পর এতে যে লাভ হবে তার অর্ধেক আমার এবং অর্ধেক তোমার।

(২) আর মুদারাবার দ্বিতীয় রুকন হল কবুল অর্থাৎ উল্লিখিত প্রস্তাবে সাড়া দেয়া। অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তি উক্ত প্রস্তাবে রাজি হয়ে বলল, আমি আপনার এই প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। আর এর মাধ্যমেই মুদারাবা চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেল।

মুদারাবা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী

(১) পুঁজিদাতা মুদারিবকে যে অর্থ প্রদান করবে তা নগদ মুদ্রা হতে হবে অথবা এমন সম্পদ প্রদান করবে যার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা ব্যবসা করা যায়। সুতরাং মুদ্রা ব্যতীত অন্য কোন মাল দিলে মুদারাবা বৈধ হবে না।

(২) চুক্তি সম্পাদনের সময় মূলধনের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে, যাতে পরে এ নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত না ঘটে।

(৩) মূলধন নগদ অর্থ হতে হবে। ঋণের দ্বারা মুদারাবা বৈধ হবে না।

(৪) মূলধন মুদারিবের হাতে সম্পূর্ণভাবে অর্পণ করতে হবে। এখানে পুঁজিদাতার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।

(৫) অংশীদারিত্ব যাতে শেষ না হয়ে যায় সেজন্য আগেই উভয়ের মাঝে মুনাফার হার সুনির্দিষ্ট থাকতে হবে। যেমন এ রকম বলে নেয়া যে, মুনাফা যাই হোক আমরা অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ কিংবা এক-চতুর্থাংশ ভাগ করে নেব। কিন্তু এ রকম চুক্তি করা যাবে না যে, মুনাফা যাই হোক মুদারিব একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পাবে। এ রকম করলে বৈধ হবে না।

(৬) মুদারিবের যা খরচ নির্দিষ্ট করা হবে তা লভ্যাংশ থেকেই ধর্তব্য হবে, মূলধন থেকে নয়। সুতরাং মুদারিবকে মূলধন থেকে কিছু প্রদান করা হলে মুদারাবা বৈধ হবে না।

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে মুদারাবা পদ্ধতির প্রয়োগ

উপরোল্লিখিত ইসলামী শরীয়তের মূলনীতির আলোকে বংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহ মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে বিভিন্ন মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব খুলে জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে জমা গ্রহণ করে থাকে। যেমন–

- সাধারণ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব (Mudarabah Savings Deposit Account).
- বিশেষ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব (Special Mudarabah Deposit Account) : 5 years 10 years term.).
- সাধারণ মুদারাবা মেয়াদী সঞ্চয়ী হিসাব (Mudarabah Term Deposit Account : ৩ মাস / ৬ মাস / ১২ মাস / ২৪ মাস / ৩৬ মাস)
- বিশেষ মুদারাবা মেয়াদী সঞ্চয়ী হিসাব (Special Mudarabah Term Deposit Account).
- মুদারাবা শর্ট নোটিশ জমা হিসাব (Mudarabah Short Notice Deposit Account).
- মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয়ী হিসাব (Mudarabah Hajj Savings Account : ১-২৫ বছর).
- মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড (Mudarabah Savings Bond Scheme : ৫-৮ বছর).
- মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা (সঞ্চয়) হিসাব (Mudarabah Foreign Currency Deposit (Savings) Account).
- মুদারাবা ওয়াক্বফ জমা হিসাব (Mudarabah Waqf Cash Deposit Account).
- মুদারাবা মোহর সঞ্চয় প্রকল্প (Mudarabah Muhor Savings Account.)
- উচ্চ শিক্ষা সঞ্চয় প্রকল্প।

এগুলোকে আমানত বলা হলেও মূলতঃ এগুলো এক ধরনের অংশীদারী বিনিয়োগ। ইসলামী ব্যাংকগুলো এসবের অর্থ ইচ্ছেমত যে কোন শরীয়ত সম্মত কারবারে বিনিয়োগ করে থাকে। এ পদ্ধতিতে হিসাব খোলার সময়ই ব্যাংক তার অর্থ জমাকারীর নিকট থেকে হিসাব খোলার ফরমে লিখিত নীতিমালার মাধ্যমে বিনিয়োগের অনুমতি গ্রহণ করে।

আমানতকারীদের কিছু প্রশ্ন ও ব্যাংকের পক্ষ থেকে জবাব

- এ কারবারে শর্ত থাকে যে, জমাকৃত অর্থ খাটিয়ে লাভ হলে তা পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি অনুযায়ী 'পুঁজির মালিক' ও 'মুদারিব' উভয়ের মধ্যে ভাগ করে নেবে। এখানে আমানতকারীদের প্রাপ্ত লভ্যাংশে সুদ প্রবেশ করার কোন সুযোগ নেই; যদি ব্যাংক জমাকৃত অর্থ কোন অবৈধ ব্যবসায় না খাটায় কিংবা ইসলামী শরীআহ্ নীতির লংঘন না করে। আর লোকসান হলে তার সবটাই আমানতকারীদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয়। মুদারিব তথা ব্যাংক এ ক্ষেত্রে লোকসানের কোন অংশ বহন করে না।
- আমানতকারীগণের মধ্য থেকে অনেকে অভিযোগ করেন যে, এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো সঠিক নীতি অবলম্বন করছে না। তাদের অভিযোগ হল, ইসলামী ব্যাংকগুলো লাভ গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব ঠিকই গ্রহণ করছে কিন্তু লোকসান গ্রহণ করছে না। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা করছে এবং কোন অবস্থাতেই শরীআহ নীতি অনুসরণ করছে না। এ ব্যাপারে একটি ইসলামী ব্যাংকের কাছে জানতে চাওয়া হলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত জবাবসমূহ প্রদান করা হয়–

(১) এ ক্ষেত্রে মুদারিব তথা ব্যাংকের শ্রম বৃথা যায়।

(২) শ্রমের বিনিময়ে ব্যাংক কোন পারিশ্রমিক পায় না।

(৩) শ্রম বৃথা যাওয়াই ব্যাংকের লোকসান।

(৪) ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসতর্কতা, দায়িত্বহীনতা, কর্তব্যে অবহেলা এবং ভুলের কারণে যদি লোকসান হয় তাহলে ব্যাংকই লোকসান বহন করে।

(৫) মুদারাবা কারবারের এ নিয়ম মেনেই জমাকারী অর্থ জমা রাখে।

(৬) এ পদ্ধতিতে টাকা জমা রাখার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ন্যায় জমাকারীদের সুনির্দিষ্ট লাভ প্রদানের নিশ্চয়তা দেয় না।

(৭) বিনিয়োগের মাধ্যমে যে মুনাফা অর্জিত হয় চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী পূর্বে নির্ধারিত হারে ব্যাংক ও জমাকারীদের মধ্যে মুনাফা বন্টন করা হয়। আর বিনিয়োগের মাধ্যমে যদি লাভ অর্জিত না হয় তাহলে জমাকারীদের কোন লভ্যাংশ দেয়া হয় না। সুতরাং কোন অবস্থাতেই এ ক্ষেত্রে অবিচার করার প্রশ্ন ওঠতে পারে না। ব্যবসায় যাতে কোন লোকসান না হয় সে ব্যাপারে ব্যাংক অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে এবং এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

অতএব ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মুদারাবা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে ইসলামী শরীআহ নীতির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হয় এবং জমা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনরূপ শরীআহ লংঘন না হয় এমন নীতি অবলম্বন করতে হবে।

গবেষকের নিজস্ব পর্যবেক্ষণেও মনে হয়েছে 'মুদারাবা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহে কোন ধরনের শরীআহ লংঘন হয় না।

ইসলামী ব্যাংকসমূহে মুদারাবা বিনিয়োগের চিত্র

পূর্বেই বলা হয়েছে, মুদারাবা একটি অংশীদারী বিনিয়োগ পদ্ধতি। এখানে এক পক্ষ মূলধন সরবরাহ করে এবং অন্য পক্ষ ব্যবসা পরিচালনা করে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহ অর্থ আমানতকারীর অর্থ জমা রাখে এবং মুদারিব হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করে। ব্যবসায়ে অর্জিত মুনাফা সাহিব আল-মাল এবং মুদারিব উভয়েই পূর্বে নির্ধারিত চুক্তি অনুসারে ভাগ করে নেয়। আর লোকসান হলে মূলধন সরবরাহকারী তার সমস্ত দায়ভার বহন করে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের শ্রম বিফলে যায়।

বস্তুতঃ বিশ্বস্ত, আমানতদার লোকের অভাব ও বিশ্বাসভঙ্গের কারণে এ দেশে মুদারাবা কারবার গড়ে ওঠেনি এবং এ একই কারণে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহও এখন পর্যন্ত এ কারবারের ব্যাপক প্রচলন করতে পারেনি। নিম্নে বাংলাদেশের চারটি ইসলামী ব্যাংকের ১৯৯৫ সালের শরী'আহ মোডভিত্তিক বিনিয়োগের একটি চিত্র তুলে ধরা হল [২২]–

সারণী-১

বিনিয়োগ মোড	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
মুরাবাহা	৫৩.৫৪%	....	৮৫.৭৯%	৭৫.০০%
বাই' মু'আজ্জাল	১৭.২৮%	....	০৭.৭২%	০৪.৭৬%
হায়ার পারচেজ	১৪.৫৭%	....	০৩.৬৭%	১০.০০%
করজে হাসানা	০৩.৫৬%	....	....	....
মুশারাকা	০৩.৮৭%	....	....	০৩.৯৩%
মুদারাবা	....	....	....	০০.২৪%

উপরের সারণী থেকে দেখা যায় যে, চারটি ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে কেবলমাত্র সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকই তার মোট বিনিয়োগের শতকরা ০.২৪ ভাগ মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করেছে। পক্ষান্তরে দেশের সর্ববৃহৎ ইসলামী ব্যাংক; ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ও অন্য তিনটি ব্যাংক মুদারাবাা কারবারে কোন ধরনের বিনিয়োগ প্রদান করেনি। সুদের অন্যতম প্রধান বিকল্প মুদারাবা কারবার বাংলাদেশের কোন ইসলামী ব্যাংকেই প্রচলন নেই। অথচ ইসলামী ব্যবসা ও ব্যাংকিং সংক্রান্ত সকল মৌলিক গ্রন্থেই কেবলমাত্র মুশারাকা ও মুদারাবা বিনিয়োগকেই সুদের যথার্থ বিকল্প হিসেবে সুপারিশ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের বক্তব্য এভাবে উপস্থাপন করে যে, বর্তমান সময় ও বিরাজমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মুশারাকা ও মুদারাবা কারবার করা কঠিন হয়ে পড়েছে। ব্যবসায়ীদের অধিকাংশ নিজেরাই মুদারাবা চায় না। কেননা তাদের অনেকে তাদের পূর্ণ হিসাব জানাতে চায় না। তদুপরি তারা মনে করে যে, মুয়াজ্জালে তাদের নিজেদের মুনাফা অধিক হবে।

অন্যদিকে ২০০৯ সালে ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিবরণীতে দেখা যায়, একমাত্র ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তার মোট বিনিয়োগের মাত্র ০.০৩ ভাগ মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান করেছে। এছাড়া অন্য কোন ব্যাংক এ পদ্ধতিতে কোন বিনিয়োগ প্রদান করেনি। তথ্যটি নিম্নে উপস্থাপন করা হল[২৩]–

সারণী-২

বিনিয়োগ মোড	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	আইসিবি ইসলামী ব্যাংক	আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক	এক্সিম ব্যাংক	শাহজালাল ব্যাংক	ব্যাংক আল ফালাহ
মুদারাবা	০.০৩%.	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক পদ্ধতি আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছে। জমা গ্রহণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, মুনাফা অর্জন ইত্যাদিতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের গড় আশ্বস্ত হওয়ার মত এবং জাগতিক উন্নতির মাপকাঠিতে এ ব্যাংক চোখে পড়ার মত। কিন্তু যে ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংক সাফল্য দেখাতে পারেনি তাহল, মুদারাবার মত খাঁটি ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতির অনুসরণ।

উপসংহার

ইসলামী অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হলে যে সব বিনিয়োগ প্রয়োগ করা দরকার তার মধ্যে মুদারাবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এ পদ্বতির মাধ্যমে সমাজে কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু আধুনিক অর্থব্যবস্থায় সুদের প্রাবল্য এবং ব্যক্তি চরিত্রের দৈন্যতার কারণে এ পদ্ধতির বাস্তবায়ন এখন স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। এ দশা থেকে উত্তরণের জন্য নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদান করা যায়–

১. দেশবাসীকে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার সুফল সম্পর্কে অবহিত করা এবং শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং সাধারণ মানুষের মাঝে সুদের কুফল এবং ইসলামী অর্থ ও ব্যবসা নীতির গুরুত্ব তুলে ধরা।

২. ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রতিটি শাখায় তাদের সব ধরনের লেনদেনকারী তথা সব স্কীমে জমাকারী এবং সকল বিনিয়োগগ্রহীতাদের নিয়ে বছরে কমপক্ষে একবার বা দুইবার গ্রাহক সমাবেশ করা। এ সমাবেশে সর্বজন শ্রদ্ধেয় 'উলামা-মাশায়েখের দ্বারা মুদারাবা ব্যবসানীতির শরয়ী গুরুত্ব সম্পর্কে গ্রাহকদেরকে সঠিক ধারণা প্রদান করা।

৩. সরকারকে ইসলামী ব্যাংকিং উপযোগী পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিং আইন প্রবর্তনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং এ চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

৪. প্রচলিত আইনের মাঝে যতটুকু সম্ভব, শরীআহ পালনে ততটুকু এবং তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার প্রয়োজন। এ আইনের মাঝেই মুদারাবা বিনিয়োগ প্রদান যতটুকু সম্ভব কার্যকর করে ইসলামী ব্যাংকগুলোর নীতিনির্ধারক ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৫. দ্রুত বিকাশমান ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তি সরবরাহের লক্ষ্যে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স এবং এতদসম্পর্কিত কোর্স প্রবর্তন করা দরকার। এ ব্যাপারে দেশবাসীকে ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স প্রবর্তনের সুফল সম্পর্কে অবহিত করা এবং দাওয়াতি কাজের মাধ্যমে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং সাধারণ মানুষের মাঝে ইসলামী অর্থব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরা এবং এ দাওয়াত অব্যাহত রাখা।

তথ্যনির্দেশ

১. আল-কুরআন, ২:৬০

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا

২. আল-কুরআন, ২:৬১ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ

৩. সাবেক, সাইয়্যেদ, *ফিকহুস সুন্নাহ,* কায়রো : দারুল ফাতহি, খ্রি. ১৯৯৯, খ.৩, পৃ. ১৪৭

المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض و هو السفر للتجارة

৪. আল-কুরআন, ৭৩:২০

علم أن سيكون منكم مرضي- و أخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله - وأخرون يقاتلون في سبيل الله -

৫. সাবেক, সাইয়্যেদ, *ফিকহুস সুন্নাহ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

المضاربة هي عقد بين طرفين علي أن يدفع أحدهما نقدا إلي الأخر ليتجر فيه- علي أن يكون الربح بينها حسب ما يتفقان عليه -

৬. আল জাযাইরী, আবু বকর জাবির, *মিনহাজুল মুসলিম,* তা.বি. পৃ. ৪৯৩

المضاربة عقد شركة بين طرفين يكون المال فيها من جانب والعمل من جانب والربح بينهما- وهي نسبي شا نع غير محدد-أي لكل منهما نسبة كا لثلث وا لثلثين- و هذا ما أجمع عليه علماء المسلمين-

৭. মাওলানা উবায়দুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফাতাওয়া ও মাসাইল,* ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, খ্রি. ২০০১, খ. ৩, পৃ. ১৬৩

৮. মান্নান, মোহাম্মদ আবদুল, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা,* ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, খ্রি. ২০০৭, পৃ, ১৩৪

৯. *Accounting Auditing and Organization for Islamic Financial Institutions,* 2004. Statement of the Standard, p-231.

১০. আল-কুরআন, ৩:২০ و أخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله

১১. আল-কুরআন, ৬২:১০

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -

১২. আল-কুরআন, ২:১৯৮ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

১৩. সেন্ট্রাল শরীআহ কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্যের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, তারিখ: ২৫/১২/২০০৮ ইং

[১৪]. মালিক, ইমাম, *আল-মুয়াত্তা*, তা:বি: খ.-৪, পৃ. ৪৩৮

قالَ مَالِكٌ وَجْهُ القِرَاضِ المَعْرُوفِ الجَائِزِ أنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ المَالَ مِنْ صَاحِبِهِ عَلَى أنْ يَعْمَلَ فِيهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَنَفَقَةُ العَامِلِ فِي المَالِ فِي سَفَرِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ وَمَا يُصْلِحُهُ بِالمَعْرُوفِ بِقَدْرِ المَالِ إِذَا شَخَصَ فِي المَالِ إِذَا كَانَ المَالُ يَحْمِلُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا فِي أهْلِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهُ مِنَ المَالِ وَلَا كِسْوَةَ.

[১৫]. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ১১৯৫

حَدَّثَنِي مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ عَنْ أبِيهِ أنَّهُ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى العِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّا عَلَى أبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ وَهُوَ أمِيرُ البَصْرَةِ فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ ثُمَّ قَالَ لَوْ أقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أمْرٍ أنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ ثُمَّ قَالَ بَلَى هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ أرِيدُ أنْ أبْعَثَ بِهِ إِلَى أمِيرِ المُؤْمِنِينَ فَأُسْلِفُكُمَاهُ فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ العِرَاقِ ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالمَدِينَةِ فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ المَالِ إِلَى أمِيرِ المُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَكُمَا فَقَالَا وَدِدْنَا ذَلِكَ فَفَعَلَ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا المَالَ فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَا فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ أكُلُّ الجَيْشِ أسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أسْلَفَكُمَا قَالَا لَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ابْنَا أمِيرِ المُؤْمِنِينَ فَأسْلَفَكُمَا أدِّيَا المَالَ وَرِبْحَهُ فَأمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ وَأمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ هَذَا لَوْ نَقَصَ هَذَا المَالُ أوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ فَقَالَ عُمَرُ أدِّيَاهُ فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ يَا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا فَقَالَ عُمَرُ قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا فَأخَذَ عُمَرُ رَأْسَ المَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ وَأخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ المَالِ -

[১৬]. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং –১১৯৬

و حَدَّثَنِي مَالِك عَنْ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا -

[১৭]. ইবনে মাজাহ, ইমাম, *আসসুনান*, অধ্যায় : আত-তিজারাত, অনুচ্ছেদ : আশ-শিরকাতু ওয়াল মুদারাবাহ, আল-কুতুবুস সিত্তা, রিয়াদ : দারুস সালাম, খ্রি. ২০০০, পৃ. ২৬১৩

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أبِيهِ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ البَرَكَةُ البَيْعُ إِلَى أجَلٍ وَالمُقَارَضَةُ وَأخْلَاطُ البُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلبَيْتِ لَا لِلبَيْعِ

[১৮]. *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

[১৯]. যুহায়লী, ড. ওয়াহবা, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, পেশাওর : মাকতাবায়ে হাক্কানিয়্যাহ, খ্রি. ১৯৯৬, খ.৪, পৃ. ৮৩৮

وأما الإجماع: فما روي عن جماعة من الصحابة أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة ولم ينكر عليهم أحد- فكان إجماعا

[২০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪০

ا لمضاربة المطلقة : هي أ ن يدفع رجل ا لمال إ لي أخر بدون قيد- ويقول : " دفعت هذا المال إليك مضاربة علي أن ا لربح بيننا كذا منا صفة أو أثلاثا- و نحو ذلك-

[২১]. প্রাগুক্ত

المضاربة المقيدة : هي أ ن يدفع شخص إ لي أخر الف دينار مثلا مضاربة علي أن يعمل بها في بلدة معينة- أو في بضاعة معينة- أو في وقت معين- أ و لا يبيع ولا يشتري إلا من شخص معين -

[২২]. ইসলাম মুজাহিদুল, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ পরিপালন : ব্যাংক ও বিনিয়োগগ্রহীতার দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী ব্যাংকিং*, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা, ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, খ্রি. ২০০৪, পৃ. ৫১

[২৩]. ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ঃ ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৪, পৃষ্ঠা ১১৩-১২৬

বাংলাদেশে ইসলামী আইন : সমস্যা ও সম্ভাবনা

ড. মো. মাসুদ আলম*
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান**

[সারসংক্ষেপ : ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়; একটি কল্যাণমূলক জীবন ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ ইসলামী বিচার ব্যবস্থা। ইসলামী বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার অন্যতম নমুনা। এ বিচার ব্যবস্থা মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য শ্রেষ্ঠতম নিআমত। মানব সমাজের বৃহত্তর পর্যায়ে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে পার্থিব জীবনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুশাসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সহজ হবে। বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র দেশ। মুসলিম অধ্যুষিত স্বাধীন-সার্বভৌম দেশটির রয়েছে ইসলামী ঐতিহ্যের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। এ দেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলামী আদর্শের অনুরাগী। তাই দেশটিতে ইসলামী আইন প্রবর্তনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামী আইন সম্পর্কে সর্বস্তরের বিশেষ করে শিক্ষিত মহলের সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণে এসব দেশে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন কিছুটা জটিলও বটে। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে বাংলাদেশে ইসলামী আইন এবং এর সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।]

হিজরী প্রথম বর্ষ থেকেই মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ইসলামী আইন দ্বারা শাসিত হয়ে আসছে। দীর্ঘকাল ধরে এ ধারা অব্যাহত থাকে। ইউরোপীয় মুসলিম স্পেন ও বর্তমান পর্তুগালসহ অনেক দেশ দীর্ঘ আটশ বছর ইসলামী আইন দ্বারা শাসিত হয়েছে। উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত (১৭৫৭ খ্রি.) ইসলামী আইন কার্যকর ছিল। গত শতকের প্রথম দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে তুর্কী খিলাফতের অবসান হওয়া পর্যন্ত আফ্রিকার উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমসহ মধ্য প্রাচ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা ইসলামী আইন দ্বারা শাসিত হয়েছে। উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
** এম.ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পতনের পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা ইসলামী আইন বলবৎ রাখে। অতঃপর তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আইন প্রণয়নের পর ধীরে ধীরে প্রতিটি বিভাগ থেকে ইসলামী আইনের বিলুপ্তি ঘটতে থাকে। তবে আইন প্রণয়নে তারা ব্যাপকভাবে ইসলামী আইনের সহায়তা গ্রহণ করে। এ কারণেই তাদের প্রণীত আইনের মধ্যে ইসলামী আইনের উপাদান ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়। মুসলিম পার্সোনাল ল' আকারে ইসলামী আইনের কয়েকটি অধ্যায় তারা বলবৎ রাখে। এমনকি ব্যক্তিগত আইনও পরিবর্তন করে সরাসরি মুসলমানদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের কাঠামো ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করার ঝুঁকি নেয়নি। তবে আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে ইসলামী আইনের যে ভিত রচিত হয়েছিল তা এতই মজবুত ও বাস্তবসম্মত ছিল যে, বিশ্বমানবতা হাজার বছরেরও বেশী সময় এই আইনের দ্বারা শাসিত হয়েছে। এজন্য বিগত প্রায় দুশো বছরে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ব্রিটিশ ল' এর একচ্ছত্র আধিপত্য সত্ত্বেও মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী আইনের আবেদন ও গ্রহণযোগ্যতা কোন না কোন পর্যায়ে অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছে। কিন্তু আজকের মুসলমানদের সমস্যা ভিন্নতর। কেননা ব্রিটিশরা এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পূর্বে এক শ্রেণীর লোকদের তাদের শিক্ষা, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে তোলার পর এদের হাতে শাসন-ক্ষমতা অর্পণ করে যায়। এই নব্য শাসক শ্রেণী চিন্তা-চেতনায়, মন-মননে ও ভাবাদর্শে কার্যত সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশদের অনুগামী। ব্রিটিশরা এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও এদেশীয় শাসক শ্রেণী তাদের প্রণীত আইন কাঠামো বলবৎ রাখে। তাদের ধারণা হলো ইসলামে একটি আধুনিক দেশ ও জাতিকে শাসন করার মত উপযুক্ত কোন আইন নেই।

ইসলাম আধুনিকতা বিবর্জিত ও সময়-অনুপযোগী কোন জীবন দর্শন তো নয়ই, বরং ইসলামই চির আধুনিক ও একমাত্র কালজয়ী পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ। আল্লাহ্ তাআলা বলেন– "নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহ্র নিকট একমাত্র জীবন-বিধান"।[১] অপর এক আয়াতে আছে–

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন (ধর্ম) পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন-বিধান মনোনীত করলাম"।[২] ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম ইহ বা পারলৌকিক জীবনে সফলতা দানের নিশ্চয়তা দেয়নি। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবন বিধান গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত"।[৩]

ইসলাম যেহেতু গতিশীল সর্বাধুনিক জীবনবিধান, কাজেই যুগে যুগে অবস্থা ও প্রয়োজনের দাবি অনুসারে ইসলামের আইনগুলো আধুনিক রূপ নিবে, বাহ্যিক পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হতে পারে; কিন্তু মূল ও অভ্যন্তরীণ গুণাবলীতে কোন পার্থক্য দেখা যাবে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ওয়াদা রয়েছে। "কোন মিথ্যা এতে প্রবেশ করতে পারে না, অগ্র হতেও নয়, পশ্চাত হতেও নয়। এতো প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নাযিল হয়েছে"।[৪]

ইসলামী আইন এবং পাশ্চাত্য আধুনিকতার মধ্যে পার্থক্য এখানেই। তাই আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতাকে আত্মস্থ করেই ইসলামী আধুনিকতা নিজস্ব পথে এগিয়ে চলে।

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। এদেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় ৮৮% মুসলিম। আর এদেশে ইসলাম আগমনের পেছনে রয়েছে সোনালী ইতিহাস। তৎকালীন ভারত উপ-মহাদেশের বাইরে থেকে যেসব মুসলমান আগমন করেছিলেন তাদেরকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. কিছু সংখ্যক মুসলিম ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আগমন করে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করেন।
২. কিছু সংখ্যক মুসলিম হলেন ওলী, দরবেশ, ফকীর। তাঁরা ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে সারাজীবন অতিবাহিত করে এখানেই ইন্তেকাল করেন।
৩. এক শ্রেণীর মুসলিম এসেছিলেন বিজয়ীর বেশে। তাদের বিজয়ের ফলে এদেশের মুসলিমদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের সিন্ধু প্রদেশে সর্বপ্রথম মুহাম্মদ ইবনে কাসিম বিজয়ীর বেশে আগমন করেন। তাঁর বিজয় পাঞ্জাবের মুলতান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বাংলায় মুসলমানদের আগমন দূর-অতীতের কোন এক শুভক্ষণে হয়ে থাকলেও তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছিল হিজরী ৬০০ সাল মোতাবেক ১২০৩ খ্রি.। তৎকালীন ভারত সম্রাট কুতুবুদ্দিন আইবেকের (৬০২/১২০৬) সময় ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে বখতিয়ার খিলজী (১২০৩ খ্রি.) বাংলায় অলৌকিকভাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।[৫] এসময় থেকে ভারতের পশ্চিমাঞ্চল, আফগানিস্তান, ইরান, আরব, তুরস্ক থেকে অসংখ্য মুসলিম বাংলায় আগমন করেন। তখন বাংলার শাসক ছিলেন লক্ষ্মণ সেন। মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী নিয়ে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ ইবনে বখতিয়ার খিলজী নদীয়া জয় করেন এবং শতাব্দীকাল পর ১৩৩০ খ্রি. মুহাম্মদ তুঘলক শাহ পূর্বাঞ্চল জয় করেন এবং সাতগাঁও ও সোনারগাঁওয়ে যথাক্রমে রাজধানী স্থাপন করেন।[৫]

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ ইবনে বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের পর থেকে ২৩ জুন ১৭৫৭ খ্রি. পলাশী প্রান্তরে মুসলিম শাসনের পতন পর্যন্ত (১২০৩-১৭৫৪) ৫৫৪ বছরে ১০১ জন বা ততোধিক শাসক বাংলায় শাসনকার্য পরিচালনা করেন।[৬] মুসলিম জাতি তাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা যথাযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তান আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়। এজন্য দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট এই উপমহাদেশে পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ১৯৭১সনে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলামী আইনের সমস্যা

১. শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি ২. রাজনৈতিক কারণ ৩. ধর্মীয় কারণ ও ধর্মীয় নেতাদের অনৈক্য ৪. ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব ৫. ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ৬. ইসলামী আইনের কার্যকারিতা ও উপস্থাপনে দুর্বলতা ৭. দেশী-বিদেশী প্রচার মাধ্যমের অপপ্রচার।

১. শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি

আমাদের দেশে পরস্পর বিপরীতধর্মী দুটি শিক্ষা পদ্ধতি চালু আছে। একটি মাদ্রাসা শিক্ষা এবং অপরটি সাধারণ শিক্ষা নামে পরিচিত। প্রথমটি ইসলামী শিক্ষা বলে দাবি করে এবং দ্বিতীয়টি আধুনিক শিক্ষা হিসেবে গৌরববোধ করে। যারা মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন তারা কুরআন, হাদীস, ফিক্হ ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যয়ন করেন বটে, কিন্তু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার তেমন কোন সুযোগ পান না। ফলে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের যত সমস্যা আছে, সেগুলোর আধুনিক রূপ ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তারা কোন ধারণাই লাভ করেন না। ফলে মানব জীবনে সমস্যার যে সুষ্ঠু ও নির্ভুল সমাধান কুরআন ও হাদীসে দেয়া হয়েছে তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার কোন সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গিই তারা লাভ করতে পারেন না। এ কারণে সুদীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করেও তারা যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন তা আধুনিক বিশ্বের প্রয়োজন পূরণে প্রযুক্তির দৌড়ে কার্যত ব্যর্থতার গ্লানি বয়ে আনে।

পক্ষান্তরে যারা আধুনিক শিক্ষা অর্জন করেন তারা প্রচলিত দুনিয়ার জ্ঞান অর্জন করতে পারেন বটে, কিন্তু নির্ভুল আদর্শিক জ্ঞানে তারা সমৃদ্ধ হতে পারেন না। এ শিক্ষার নির্ভুল আদর্শিক পাশাপাশি ইসলামের পূর্ণ আনুগত্য করতে তাদেরকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি শিখে নিজেদেরকে খাঁটি মুসলমান রূপে গড়ে তুলতে অতিরিক্ত শ্রম ও সময় ব্যয় করতে হয়।[৭]

২. রাজনৈতিক কারণ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অনেক দলের নাম লক্ষ করা গেলেও তারা মূলত দুটি প্রধান মেরুতে অবস্থিত। (ক) একটি ধারা সমাজ জীবনের সকল পর্যায়ে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের ঘোরবিরোধী এবং (খ) অপরটি ইসলামী আইন বাস্ত বায়নের লক্ষে প্রচেষ্টারত। এদেশে ইসলামী আইন ও ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে এই দ্বিমুখী রাজনৈতিক মেরু একটি বড় অন্তরায়।[৮]

৩. ধর্মীয় নেতাদের অনৈক্য

বাংলাদেশে যারা ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে দেখতে চান তাদের স্লোগান, লেখনী ও বক্তৃতা-বিবৃতিতে ঐক্য লক্ষ্য করা গেলেও কার্যত তারা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত। ফলে তারা রাজনৈতিক অঙ্গনে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারছেন না। তাদের এ অনৈক্য বাংলাদেশকে একটি আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার পথে বড় অন্তরায়।[৯]

৪. ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব

আমাদের দেশের উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থায় পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের আওতায় শিক্ষাদান করা হলেও ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের তেমন কোন ধারণাই দেয়া হয় না। কোনো কোনো পর্যায়ে ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সামান্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল খণ্ডিত ও বিকৃত। ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের কাছে ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। এর প্রভাব পড়ে সাধারণ জনগোষ্ঠীর উপর। এটাও বড় ধরনের সমস্যা।[১০]

৫. ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা তথা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচয়ে আলিয়া ও কওমী নামে যে দুটো ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে তাতেও ইসলামী বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আধুনিক মন-মানসের উপযোগী কোন শিক্ষাক্রম নেই। ফলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যারা উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে বের হচ্ছেন তাদের অধিকাংশই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের মতই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কখনো খণ্ডিত ধারণা লাভ করছেন, এবং আধুনিক বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে যাচ্ছেন। ফলে তারাও জনগণের সামনে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে জনসমাজে ইসলামী বিচার ব্যবস্থার

সুফল ও প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার কুফল সম্পর্কে অবহিত করতে পারছেন না। এটিও একটি বড় সমস্যা।[১১]

৬. ইসলামী আইনের কার্যকারিতা উপস্থাপনে দুর্বলতা

ইসলামী আইন যে বহু ধর্মীয় জাতি গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত একটি আধুনিক সমাজ রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সক্ষম তা ইসলামের আদর্শের অনুসারীগণ জনগণের সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারছেন না। ফলে জনগণের ভেতরে একটি অস্পষ্টতা, ভীতি, সংশয় ও অজ্ঞতা থেকে যাচ্ছে। এটিও একটি সমস্যা।[১২]

৭. দেশী-বিদেশী মিডিয়ার অপপ্রচার

হযরত ঈসা আ. এর ইন্তিকালের সুদীর্ঘ ৫৭০ বছর পর মুহাম্মদ স. এর শুভ আবির্ভাব হয়। এই দীর্ঘ সময়ে কোন নবী-রাসূল না থাকায় তদানীন্তন জনগোষ্ঠী যেমন আল্লাহ্‌র একত্ববাদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে গিয়েছিল এবং শয়তানের অপপ্রচার তাদের সন্দেহের আবর্তে ফেলে দিয়েছিল। ঠিক তদ্রূপ ১৯৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে ইংরেজদের কাছে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে মুসলিম জাতিসত্তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল এবং ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কার্যত মুছে গিয়েছিল। ইসলাম বিদ্বেষী দেশী-বিদেশী প্রচার মাধ্যমগুলো ইসলাম, বিশেষত ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে অপপ্রচার চালিয়ে আসছিল। এ ধারা এখন নতুন মাত্রা পেয়েছে। এতে বিশাল জনগোষ্ঠী ইসলামী দর্শন সম্পর্কে বিভ্রান্তির শিকার হয়। এটিও একটি মারাত্মক সমস্যা।[১৩]

ইসলামী আইনের সম্ভাবনা

১. শিক্ষা ব্যবস্থায় সমন্বয় সাধন

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হলেও এর মধ্যে কোন সম্ভাবনা লুকিয়ে নেই, বিষয়টি তদ্রূপ নয়। ইসলামী বিচার ব্যবস্থাকে সম্ভাবনাময় পর্যায়ে নিয়ে আসতে হলে প্রয়োজন সাধারণ আইন শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী আইন শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এজন্য যেমন প্রয়োজন ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের, তদ্রূপ প্রয়োজন একটি আইন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা। এ একাডেমীই আমাদের পূর্ব পুরুষদের কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করবে এবং ইসলামী আইনের গ্রন্থ রয়েছে তা শুধু মাতৃভাষায় অনুবাদই করবে না, ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা জানার জন্য যা অপরিহার্য, বর্তমান যুগ চাহিদার দাবি অনুসারে তা নতুনভাবে ঢেলে সাজাবে। এ পদ্ধতিতেই পূর্ণ সফলতা অর্জন করা সম্ভব। উল্লেখ্য, ইসলামী আইনের গ্রন্থসমূহ প্রধানত আরবী ভাষায়

রচিত। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সাধারণত আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ। এই অনভিজ্ঞতার কারণে কিছু শোনা কথার উপর ভিত্তি করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকেই প্রায়শ ইসলামী আইন ও বিধান সম্পর্কে নানা ধরনের ভুল ধারণা পোষণ করেন এবং তা প্রচার করেন। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, যারা এরকম অর্থহীন চিন্তাধারা পোষণ করেন, তারা নিজেদের অসার চিন্তা ও বিবেকের দৈন্য-দশারই প্রকাশ ঘটান। যদি তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের ইসলামী আইন শাস্ত্রের (ফিক্হ শাস্ত্র) গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে গবেষণা করতেন তাহলে দেখতে পেতেন গত দেড় হাজার বছরে আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ শুধু অর্থহীন বিতর্কেই জড়িয়ে সময় নষ্ট করেননি, বরং তারা পরবর্তী বংশধরদের জন্য রেখে গেছেন এক মহান উত্তরাধিকার।

২. অতীত ঐতিহ্য অনুসরণ

এছাড়াও বলা যায়, বিগত দিনসমূহে পৃথিবীর এক বিশাল অংশ জুড়ে মুসলমানগণ যে কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার সব কটি আইনই ছিল ইসলামী আইন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। তারাই এ রাষ্ট্রের জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ও চীফ জাস্টিস নিযুক্ত হতেন। তাদের রায় দ্বারা বিচার বিবরণীর বিপুল সম্পদ তৈরি হতো এবং তারা আইনের প্রায় সব বিভাগ নিয়েই আলোচনা করেছেন। এজন্য প্রয়োজন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি দলকে বাছাইপূর্বক এ কাজে নিয়োজিত করা, যারা বর্তমান যুগের আইনের গ্রন্থরাজির পাশাপাশি সেসব মূল্যবান বিষয়কেও সাজিয়ে দিবেন। বিশেষত এমন কতিপয় আইন ও বিচার সম্পর্কীয় গ্রন্থ আছে যার বঙ্গানুবাদ হওয়া একান্ত জরুরী।

৩.কুরআনের ব্যাখ্যা গ্রন্থ অনুবাদ

কুরআনের আইন বিষয়ে বিশেষত তিনটি অনবদ্য গ্রন্থ আছে−

ক. ইমাম আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী আর-রাজী আল জাসসাস আলহানাফী (জ. ৩০৫/৯১৭, মৃ. ৩৭৫/৯৮০) প্রণীত 'আহকামুল কুরআন'-এর আংশিক বঙ্গানুবাদ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

খ. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আল আনসারী আলকুরতুবী (মৃ. ৬৭১/১২৭২) প্রণীত 'আল জামে লি আহকামিল কুরআন'।

গ. ইমাম আবু বকর মুহিউদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আলী (তবে তিনি ইবনুল আরাবী নামে সমধিক পরিচিত, জন্ম. ৫৬০/১১৬৫, মৃ. ৬৩৮/১২৪০) প্রণীত 'আহ্কামুল কুরআন'।

এসব গ্রন্থের অনুশীলন আইন শিক্ষার্থীদের কুরআন থেকে সমাধান বের করার পদ্ধতি শিক্ষা দিবে। এসব গ্রন্থে কুরআনের সমস্ত বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত আয়াতের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। হাদীসে এর যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এগুলোতে তা বর্ণনা করা হয়েছে এবং মুজতাহিদগণ এর থেকে যে বিধি-বিধান বের করেছেন সেগুলো যুক্তি সহকারে পেশ করা হয়েছে।

৪. হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ অনুবাদ

দ্বিতীয় মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে হাদীসের ভাষ্য গ্রন্থসমূহ, যাতে বিধি-বিধান ছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ের উদাহরণ ও তার ব্যাখ্যামূলক বিবরণ পাওয়া যায়। এসবের মধ্যে নিম্ন বর্ণিত গ্রন্থগুলোর বঙ্গানুবাদ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বুখারী শরীফের ভাষ্য গ্রন্থ 'ফাতহুল বারী' ও 'উমদাতুল কারী'; মুসলিম শরীফের ভাষ্য গ্রন্থ নববী ও মাওলানা শিবক্কীর আহমাদ উসমানী র.-এর 'ফাতহুল মুলহিম'। আবূ দাউদ শরীফের ভাষ্য গ্রন্থ 'আওনুল মাবুদ' এবং 'বাজলুল মাজহুদ'। মুয়াত্তার ভাষ্য গ্রন্থ শাহ ওয়ালীউল্লাহ র. প্রণীত 'আওযাজুল মাসালিক'। মুনতাকাল আখবারের ভাষ্য গ্রন্থ ইমাম শাওকানীর 'নাইলুল আওতার'। মিশকাত শরীফের ভাষ্য গ্রন্থ ইদরীস কান্দলভীর 'আত-তালীকুস সাবীহ' এবং ইমাম তাহাবীর 'শারহু মাআনিল আসার'। শেষোক্ত গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় বাজারে এসেছে।

৫. ফিকহের গ্রন্থ অনুবাদ

এরপর ফিক্হ শাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থগুলোরও অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। হানাফী ফিক্হ গ্রন্থগুলোর মধ্যে ইমাম শারাখসীর 'আল মাবসূত' এবং 'শারহুস সিয়ারিল কাবীর', আল কাসানীর 'বাদাইউস সানাই', ইবনুল হুমামের 'ফাতহুল কাদীর', 'আল হিদায়া' ও 'ফাতাওয়া আলমগীরী' ইত্যাদি। সম্প্রতি শেষোক্ত গ্রন্থ দুটির বাংলা অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

শাফিঈ মাযহাবের 'কিতাবুল উম্ম', 'শারহুল মুহাজ্জাব' ও 'মুগনিল মুহতাজুল মুদাওয়ানাহ'; হাম্বলী মাযহাবের ইমাম ইবনে কুদামার 'আল মুগ্নী'; ইমাম ইবনে হাযমের 'আল মুহাল্লা', ইবনে রুশদের 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ', আল-জাযায়েরীর 'কিতাবুল ফিক্হ আলাল-মাযাহিবিল আরবাআ' এবং ইমাম ইবনুল কায়্যিমের 'যাদুল মাআদ'। উল্লেখ্য যে, শেষোক্ত গ্রন্থটি ইতোমধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ইমাম আবু ইউসুফ র.-এর 'কিতাবুল খারাজ', ইয়াহইয়া ইবনে আদামের 'কিতাবুল খারাজ', আল কাসিমের

'কিতাবুল আমওয়াল', হিলাল ইবনে ইয়াহইয়ার 'আহকামুল ওয়াকফ' ও ইমাম দিয়য়াতির 'আহকামুল মাওয়ারীস'। এ ছাড়াও ইমাম ইবনে হাযমের 'উসূলুল আহকাম', ইমাম শাতিবীর 'আল মুয়াফিকাত', ইমাম ইবনুল কায়্যিমের 'ইলামূল মুওয়াক্কিঈন' এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ র.-এর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'। শেষোক্ত গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

মোটকথা, শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করতে হলে ইসলামী শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে তুলতে হবে এবং আধুনিক শিক্ষাকে ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসতে হবে। উভয় শ্রেণীর আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে ইসলামী আইনের প্রয়োগ সময়সাপেক্ষ হতে পারে, কিন্তু অসম্ভব নয়। আরো বলা যায়, ইসলামী শিক্ষা কিংবা সাধারণ শিক্ষা নয়, বরং তা হতে হবে এমন এক পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা, যা গ্রহণ করার ফলে একজন শিক্ষার্থী যেমন দীনী ব্যাপারে পাণ্ডিত্য অর্জন করবে, তদ্রূপ বৈষয়িক বিষয়েও নেতৃত্বদানের গুণাবলী অর্জন করবে। আমাদের সোনালী যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা এদিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমাদের দেশের প্রায় আড়াই লক্ষ মসজিদের ইমাম-খতীব, মুয়াজ্জিন, খাদিম ও মুসল্লী, আলিয়া ও কওমী মাদ্রাসার হাজার হাজার উস্তাদ ও ছাত্র, অগণিত খানকাহ্‌র পীর ও মুরীদ এবং তাবলীগ জামায়াতের সাথে জড়িত লক্ষ লক্ষ মুবাল্লিগ ও কর্মী, বিপুল সংখ্যক আলোচক ও শ্রোতাবৃন্দ এবং তাফসীর মাহফিলের মুফাস্‌সির ও শ্রোতা মিলে বাংলাদেশে বিশাল ইসলামী জনশক্তি রয়েছে। ধর্মীয় ময়দানে এ জনশক্তি স্পষ্টই চোখে পড়ার মতো। কিন্তু রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলামী শক্তি এখনো উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। নির্বাচনে যে কটি ইসলামী দল অংশগ্রহণ করেছে তারা সবাই মিলেও মোট ভোটের শতকরা ১০ ভাগও পায়নি। এর মূলে রয়েছে ইসলামী দলগুলোর রাজনৈতিক ময়দানে অনৈক্য। পক্ষান্তরে ইসলাম বিরোধী শিবিরে বৃহত্তর ইস্যুতে ঐক্য লক্ষ করা যায়। ইসলামী দলগুলোর এই অনৈক্য ধর্মপ্রাণ ইসলাম দরদী জনগোষ্ঠীকে হতাশ করে। অথচ ইসলামী দলগুলো অহরহ ঐক্যের নসীহত করে বেড়ায়। তাদের অনৈক্য পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রতিটি অঙ্গনে পরিলক্ষিত হয়।

কুরআন মাজীদে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন– "তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না"।[১৪] অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন– "তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।"[১৫]

কাজেই বাংলাদেশে একটি অর্থবহ ও কার্যকর ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে–

ক. ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ-বিরোধী কার্যক্রম ও ষড়যন্ত্রের গভীরতা সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন দৃষ্টি রাখতে হবে এবং একই সাথে বাংলাদেশের বাস্তবতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে।

খ. বৃহত্তর ঐক্যের প্রয়োজনেই গণ-সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে অভিন্ন বক্তব্য প্রদান ও কর্মপন্থা গ্রহণে সর্বাত্মক প্রয়াস চালাতে হবে।

গ. ইসলামী দল, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও ব্যক্তিদের মাঝে যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

ঘ. ইসলামী দল, ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও ওলামায়ে কিরাম যেন পারস্পরিক অনাকাঙ্খিত বিরোধে জড়িয়ে না পড়েন; বরং সর্বোচ্চ ত্যাগের দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারেন সে লক্ষে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ ব্যাপারে প্রতিপক্ষ যেন সুযোগ গ্রহণ করে ইসলামী শক্তিকে দুর্বল করতে না পারে এবং অনৈক্যের আবর্তে ফেলে দিতে না পারে সে বিষয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

ঙ. প্রচার মাধ্যমগুলোর সংবাদ দেখে কারো বিরুদ্ধে বক্তব্য বিবৃতি দেয়ার পরিবর্তে সমঝোতার চেষ্টা করতে হবে। কেননা আল্লাহ্র নির্দেশ হচ্ছে, "আপোস-নিষ্পত্তিই শ্রেয়"।[১৬]

চ. সংবাদের সত্যতা যাচাই করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবে। এ কারণে যে, ভুলবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে বস এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়।"[১৭]

ছ. ইসলামী দল ও প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমকে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী না ভেবে সহায়ক শক্তি মনে করতে হবে। ফিক্হী ইখতিলাফী মাসাইল নিয়ে নিজেদের মধ্যে যাতে অহেতুক মনোমালিন্য সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে এবং এও স্মরণে রাখতে হবে যে ফিক্হ শাস্ত্র কুরআন-সুন্নাহ্র ন্যায় চিরন্তন নয়। বরং প্রয়োজনে কুরআন-সুন্নাহ্কে সামনে রেখে অবস্থার দাবি হিসেবে ভিন্নতর সমাধানও দেয়া যেতে পারে।

কাজেই ইসলামী দল ও এর নেতৃবৃন্দ যেন পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগামহীন, অসংলগ্ন বিষোদগারমূলক মন্তব্য না করেন কিংবা ইসলাম বিরোধী শক্তির ক্রীড়নকের ভূমিকায়

অবতীর্ণ না হন, সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সর্ব অবস্থায় প্রজ্ঞা, সহনশীলতা ও ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে।

বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক ওলামায়ে কিরাম রয়েছেন। তারা বিভিন্নমুখী দীনী খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ইসলামকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা কেন সক্রিয় নন এ প্রশ্ন অবান্তর নয়। অবশ্য এর পেছনে একাধিক কারণও রয়েছে। যেমন–

ক. আলিম সমাজের অধিকাংশই দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত। তারা ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করার সাথে সাথে মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা, মসজিদে ইমামতি কিংবা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে নিজেদের আসীন করাকেই যথেষ্ট বড় মনে করেন। ফলে সমাজ পরিবর্তনের বিশাল ঝুঁকি গ্রহণ করা তাদের অনেকের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না।

খ. যৎসামান্য আয় দিয়ে ঘর-সংসার ও পারিবারিক ব্যয়ভার নির্বাহ করতে গিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে শরীক হওয়ার গুরুত্ব তাদের নিকট খুব একটা অনুভূত হয় না।

গ. ইসলামী শিক্ষার সিলেবাসে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজের গুরুত্ব সম্পর্কীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত না থাকাও একটি বড় কারণ।

ঘ. সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে মহানবী স. কে সকল ক্ষেত্রে একমাত্র শ্রেষ্ঠ নমুনা হিসেবে মান্য করা যে অপরিহার্য এ সম্পর্কিত বিশ্বাসের ঘাটতি।

কিছু সংখ্যক পাশ্চাত্য পণ্ডিত শাস্তির ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুধাবন করতে না পেরে এবং কখনো ইসলামের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাবে আক্রান্ত হয়ে ইসলামী আইনে আরোপিত সীমিত কতিপয় অপরাধের শাস্তিকে মানুষের জন্য মর্যাদাহানিকর ও বর্বর বলে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইসলামের গোটা আইন ব্যবস্থা সম্পর্কে তুচ্ছতাচ্ছিল্যপূর্ণ মন্তব্য করছেন। তারা কল্পনার দৃষ্টিতে অবলোকন করেন যে, বর্তমানে পাশ্চাত্যে ফৌজদারী আইনের আওতায় অহরহ যেভাবে শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে, তদ্রূপ মুসলিম সমাজেও একই হারে প্রতিদিন চুরির অপরাধে হস্তকর্তন, মাদক গ্রহণের কারণে বেত্রদণ্ড এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হচ্ছে। তাদের এই বাস্তবতা-বিবর্জিত মানসিক কল্পনা তাদেরকে ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে দায়িত্বহীন ও উদ্দেশ্যমূলক মন্তব্য করতে প্ররোচিত করছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. ও খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগ থেকে পরবর্তী চারশত বছরের ইতিহাসে মাত্র ছয়বার চুরির অপরাধে হস্ত কর্তনের শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। এই তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, শাস্তির কঠোর বিধান প্রয়োগ যথাযথ করা হয়নি বা করার প্রয়োজন

হয়নি। অনুরূপভাবে বিবাহিত নারী বা পুরুষের ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে প্রস্তর রাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল।[১৮]

অথচ উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে দণ্ডবিধির কঠোরতা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও অমানবিক। সেখানে দুইশত তেইশ রকম অপরাধের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড।[১৯] অথচ চৌদ্দশত বছর পূর্ব থেকে ইসলামী আইনে মাত্র চারটি অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড নির্দিষ্ট। ইংল্যান্ডের আইনে যেসব অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড নির্দিষ্ট ছিল এক শিলিং এর অধিক মূল্যবান সম্পদ চুরি, দাঙ্গা, ব্যাংক ধ্বংস, বিচার প্রশাসনের বিরুদ্ধে অপরাধ, গণস্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে অপরাধ, নারীধর্ষণ, অপহরণ ও অন্যান্য যৌন অপরাধ তার অন্তর্ভুক্ত। কিছুদিন পূর্বেও রাশিয়াতে চুরি, পেশাদার জালিয়াতি, নারীধর্ষণ ও ঘুষ গ্রহণের ক্ষেত্রে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল এবং বর্তমানেও কম্যুনিস্ট চীনে অনুরূপ শাস্তি বলবৎ আছে।[২০]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এসব দেশে বহু অপরাধের ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের শাস্তির তুলনায় কঠোর ও ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। ইসলাম কখনো অযাচিত ও অন্যায় শাস্তি নির্ধারণ করে না এবং যথোপযুক্ত বিবেচনা ছাড়া তা কার্যকরও করে না। ইসলাম সঠিক পদ্ধতিতে বিচারের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সামগ্রিক ঘটনা, পরিবেশ ও পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে।

ইসলামী শরীয়াতে কঠোর শাস্তির বিধান আছে সত্য, কিন্তু তা হালকা বা অগভীর দৃষ্টিতে চিন্তা ও বিবেচনা করলে নির্মম বা কঠোর মনে হতে পারে। কিন্তু অপরাধে জড়িত হওয়ার ইচ্ছা ছিল না বা অপরাধী বাধ্য হয়ে অপরাধটি করেনি, এ-ব্যাপারে সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ইসলামী আইনে শাস্তি প্রয়োগ করা যায় না। ইসলামী আইনে যেসব অপরাধের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে অপরাধ প্রমাণের বিষয়টির সাথে অত্যন্ত কঠিন শর্তাবলী যুক্ত করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সামান্যতম সন্দেহের সৃষ্টি হলেই শাস্তি রহিত হয়ে যায়। কেননা মহানবী স. বলেছেন, যতদূর সম্ভব তোমরা মুসলমানদের থেকে হদ্দ (কঠোর শাস্তি) প্রতিহত কর। যদি রেহাই দেয়ার কোন সুযোগ থাকে, তবে অপরাধীর পথ ছেড়ে দাও। কারণ ইমামের (কর্তৃপক্ষের) শাস্তি প্রয়োগ করে ভুল করার তুলনায় ক্ষমা করে ভুল করা উত্তম।[২১] অপর হাদিসে আছে– "তোমরা সন্দেহের ক্ষেত্রে হদ্দ রহিত করো।"[২২]

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রা. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ও হযরত উকবা ইবনে আমির রা. বলেন, "হদ্দ কার্যকর করা তোমার জন্য সংশয়পূর্ণ হয়ে পড়লে তা রহিত করে দাও"।[২৩]

অমুসলিমদের অধিকার ব্যাহত হওয়ার অভিযোগ

ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ করা হয় যে, তা কার্যকর হলে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার চরমভাবে ব্যাহত হবে। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অবাস্তব। কেননা ইসলামী রাষ্ট্রের একজন মুসলমানের মান-সম্মান ও ইজ্জতের যে মূল্য দেয়া হয় ঠিক একই মর্যাদা দেয়া হয় অমুসলিম নাগরিকের প্রতি। মুসলিম রাষ্ট্রের ইসলামী আইন অনুযায়ী মুসলিমদের সম্পত্তিতে যে পরিমাণ কর দিতে হয়, ঠিক তেমনি অমুসলিমদেরও একই পরিমাণ কর দিতে হয়। বরং অমুসলিমদের উপর যাকাতের বিধান ব্যধ্যতামূলক নয়, কিন্তু মুসলমানদের উপর তা বাধ্যতামূলক। তাছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের কাঠামোতে কেবল রাষ্ট্র প্রধান, প্রধান সেনাপতি, প্রধান বিচারপতি তথা নির্বাহীসমূহ ব্যতীত অমুসলিমদের জন্য যে কোন পদে নিয়োগ লাভ করতে আইনগত কোন বাধা নেই। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হযরত উমর রা. এর খিলাফতকালে মিসর প্রদেশের অর্থ বিভাগ তথাকার খ্রিষ্টানদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল।[২৪]

উপসংহার

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। এদেশের অধিকাংশ মানুষ ধর্মপরায়ণ বটে। এতদসত্ত্বেও এ দেশে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে না এবং এ ক্ষেত্রে যে সমস্যা রয়েছে আন্তরিক হলে তা সমাধান করা সময়সাপেক্ষ হতে পারে কিন্তু অসম্ভব নয়। এ ছাড়া মনে রাখতে হবে, ইসলাম একটি গতিশীল জীবনবিধান হিসাবে কোন যুগের সাথে এ প্রতিষ্ঠা পাওয়ার বিষয়টি সম্পৃক্ত নয়। কাজেই আমরা মনে করি, বাংলাদেশে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যেমন সমস্যা লক্ষণীয় তদ্রূপ সম্ভাবনাও অত্যুজ্জ্বল।

তথ্যনির্দেশ

১. আল-কুরআন, ৩:১৯
২. আল-কুরআন, ৫:৩
৩. আল-কুরআন, ৩:৮৫
৪. আল-কুরআন, ৪১:২২
৫. আবব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, খ্রি. ১৯৯৪, পৃ. ২৪

৬. প্রাগুক্ত

৭. হক, ড. মুহাম্মদ ছাইদুল, *ইসলামী বিচার ব্যাবস্থা: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ* (অপ্রকাশিত থিসিস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খ্রি. ২০০৭, পৃ.৩৭৬

৮. প্রাগুক্ত

৯. প্রাগুক্ত

১০. প্রাগুক্ত

১১. প্রাগুক্ত

১২. প্রাগুক্ত

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭

১৪. আল-কুরআন, ৩:১০৩

১৫. আল-কুরআন, ৩:১০৫

১৬. আল-কুরআন, ৪:১২৮

১৭. আল-কুরআন, ৪৯:৬

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ঃ ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৪, পৃষ্ঠা ১২৭-১৩৮

ইভটিজিং প্রতিরোধ : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

নাহিদ ফেরদৌসী*

[সারসংক্ষেপ : ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শত বছর পূর্ণ হচ্ছে। নারীর মর্যাদা উন্নত করার অনেক প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু বাংলাদেশে কিছু বখাটে ছেলেদের অশালীন কর্মকাণ্ডের জন্য অসংখ্য নারীকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়েছে। সম্প্রতি ইভটিজিং সমগ্র জাতির জন্য অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় হয়ে ওঠেছে। এটি একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। এটি ব্যক্তির মৌলিক মানবাধিকার এবং সংবিধান পরিপন্থী। কিন্তু সামাজিক অসচেতনতা, নিরাপত্তাহীনতা, সুনির্দিষ্ট আইনের অভাব ইত্যাদির কারণে ইভটিজিংয়ের নেতিবাচক প্রভাব শুধু নারীর জীবনের ওপর নয়, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পড়ছে।]

ইভটিজিং যে একটি অন্যায় কাজ– আজ থেকে কয়েক বছর আগেও অনেকেই তা জানত না। সম্প্রতি ইভটিজিংয়ের নিকষ কালো ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে এক একটি জীবন। কিছুদিন পর পর বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় ইভটিজিংকে কেন্দ্র করে স্কুল ও কলেজ ছাত্রীর আত্মহনন এবং সংঘর্ষের খবর ছাপা হচ্ছে। স্কুল ও কলেজগামী মেয়েরা ইভটিজিংয়ের প্রতিক্রিয়ায় আত্মহত্যা করছে। তবে এর সঠিক পরিসংখ্যান এখনও পর্যন্ত জানা নেই। এ বিষয়ে শহরের খবর পত্রিকাগুলোতে ছাপা হলেও দেশের আনাচে-কানাচে, গ্রামীণ পরিমণ্ডলে মেয়েদের উত্যক্ত করার সব খবর পত্রপত্রিকায় আসে না। বখাটেদের সংঘবদ্ধ আক্রমণের ভয়ে অনেক পরিবার থানায় নালিশ করারও সাহস পায় না। এমনকি বখাটেদের পুনরায় আক্রমণ বা সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়ে অনেক পরিবার পুরো ঘটনা চেপে যায়। কারণ এটি শুধু নারীর জন্য অসহনীয় ব্যাপার নয়, পরিবারের সবার পক্ষেই এটি পীড়াদায়ক। ইতোমধ্যে ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় প্রতিবাদকারীকে হত্যা করার ঘটনাও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। মেয়েরাও যে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ-এই মানবিক বাস্তবতাটুকু নির্মমভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে।

---

* সহকারী অধ্যাপক, (আইন) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে একটি কিশোরী মেয়ে একা চলতে পারে না। তাকে নানাভাবে প্রতিকূলতার শিকার হতে হয়। রাস্তায়, স্কুলে-কলেজের সামনে অবস্থান করে বখাটেরা মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে। শুধু উত্ত্যক্ত শেষ কথা নয়, কখনো তারা শরীরে পর্যন্ত হাত তোলে। এটি এমন এক সমস্যা, যা শারীরিক নির্যাতনের চেয়েও ভয়াবহ। কেননা, ক্ষেত্র বিশেষে মেয়েরা এ সমস্যা বাড়িতেও প্রকাশ করতে পারে না। বাড়িতে বললে অনেক অভিভাবক মেয়েদের পড়ালেখা বন্ধ করে দেয়। শুধু ইভটিজিংয়ের কারণে একটি মেয়ের শৈশব, কৈশোর সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। এমনকি এ জাতীয় পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মেয়েটিকে বাল্য বিয়ের শিকার হতে হয়। অন্যদিকে, সামাজিক অসচেতনতা এবং বিচার প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা থাকায় ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে অপরাধীরা। শুধু বখাটেদের কারণে মেয়েদের পৃথিবী সংকুচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

বর্তমান সময়ে ইভটিজিং একটি আলোচিত বিষয় যা সব ধরনের মানুষের জন্য অর্থাৎ জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিষয়টিকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে। যেমন– একটি হলো আইনের দৃষ্টিকোণ, অন্যটি সামাজিক দৃষ্টিকোণ। ইভটিজিং যেমন আইনগত দিক থেকে ফৌজদারি অপরাধ, তেমনি সামাজিক দিক থেকে সামাজিক অপরাধ। এর শিকড় সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বা মূল্যবোধের মধ্যেই মিশে আছে। সমাজসচেতন সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই সামাজিক ব্যাধির মোকাবেলা করতে হবে। আইনের কঠোর প্রয়োগের পাশাপাশি সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এবং এই সংগে উন্নত নৈতিক মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবন ঘটানো অত্যন্ত জরুরী। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের চেয়েও প্রয়োজন উপযুক্ত নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।

ইভটিজিং এর অর্থ

সাধারণত ইভটিজিং হচ্ছে বখাটে ছেলে কর্তৃক মেয়েদেরকে অশালীন মন্তব্য বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে উত্ত্যক্ত করা। অতি সম্প্রতি এর সীমানা ছাড়িয়ে চিঠি, ই-মেইল, এসএমএস ইত্যাদির মাধ্যমে অশ্লীল মন্তব্য করা, এমনকি শরীরে হাত দেয়া পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে যা নারীর প্রতি চরম অসম্মানের প্রতীক।[১] এটি নারী নির্যাতনের ভিন্ন একটি কুৎসিত রূপ। তবে এটি শারীরিক নির্যাতনের চেয়েও ভয়াবহ। বর্তমানে এর মাত্রা এমন পর্যায়ে গেছে যে, এর থেকে পরিত্রাণ পেতে নিজের জীবনের ইতি টানতে বাধ্য হচ্ছে নারীরা। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের ১৮ মে ২০১০ তারিখের তথ্যমতে, ইভটিজিংয়ের অপমান সহ্য করতে না পেরে ৪ মাসে ১৪ জন নারী আত্মহত্যা করেছে।[২] এর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এটি স্পষ্ট যে, ইভটিজিং মানসিক

নির্যাতন, শারীরিক নির্যাতন এবং হত্যা– তিনটি অপরাধ সংঘটিত করছে। তাই আইনের দৃষ্টিতে ইভটিজিং নিঃসন্দেহে একটি ফৌজদারি অপরাধ।

ইভটিজিং এর কারণ

কোনো একক কারণে ইভটিজিংয়ের ঘটনা ঘটে না। নানা রকমের পারিবারিক , সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা ইভটিজিংয়ের মতো মন্দ আচরণের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। ওই সব নিয়ামক নির্মূল না করতে পারলে এ সমস্যার কার্যকর চূড়ান্ত সমাধান আশা করা যায় না। মূলত পারিবারিক সচেতনতার অভাব, চারিত্রিক অবক্ষয়, মুক্তবুদ্ধি চর্চার পরিবেশের, মূল্যবোধের অবক্ষয়, বিকৃত মানসিকতা, খারাপ ইচ্ছার প্রতিফলন, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, সুশিক্ষার অভাব, রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতার অপব্যবহার, অপসংস্কৃতি, গণমাধ্যমে গঠনমূলক তথ্যের স্বল্পতা, সর্বোপরি সুনির্দিষ্ট আইনি কাঠামোর অভাব প্রভৃতি কারণে এই সামাজিক ব্যাধি বিস্তার লাভ করছে। প্রধান কিছু কারণ তুলে ধরা হলো–

ধর্মীয় অনুশীলন ও মূল্যবোধের অভাব

ইভটিজিংয়ের সাথে জড়িত ব্যক্তি চরিত্রগতভাবে অত্যন্ত মন্দ স্বভাবের, এতে কোনো সন্দেহ নেই। বর্তমানে পরিবার থেকে সমাজে কোথাও সঠিক ধর্ম চর্চা নেই। ছেলেদের বখাটে ,হওয়ার পিছনে প্রাথমিক দায়ভার বর্তায় পরিবারের উপর। পরিবারের মা বাবা বা বয়স্ক অভিভাবকরা যদি তাদের সন্তানদের যথাযথভাবে ধর্মীয় অনুশীলন ও মূল্যবোধ শিক্ষা দেয় এবং সঠিক পথের সন্ধান দেয় তাহলে তাদের মন্দ পথে যাওয়ার সুযোগ কমে যাবে। পরিবারের মধ্যে যদি ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে চলা হয় এবং মন্দ কথা, অশালীন উক্তি– এগুলোকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখা হয়, তাহলে ওই পরিবারের সন্তানরা মন্দ কথা বা উক্তির ব্যাপারেও ঘৃণা বোধ করবে। অথচ পারিবারিক পরিমণ্ডলে এ দিকটি খুব একটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় না। ফলে দিন দিন মূল্যবোধের অবৰয় ঘটছে।

মাদকাসক্তি

সামাজিক অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে মাদক গ্রহণ। আর মাদকাসক্তি মন্দ কাজের সুতিকাগার। পারিবারিক ও ব্যক্তিগত হতাশা ও কষ্ট দূর করতে তরুণ সমাজ দিন দিন ব্যাপকভাবে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। মাদকের সহজ প্রাপ্তি এবং পরিবারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যথাযথ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে অনীহার কারণে অনেকে এই খারাপ অভ্যাস গড়ে তুলছে।

মাদক সেবনকারীর মানসিক ভারসাম্য থাকে না। তাই এ অবস্থায় সে যে কোনো ধরনের অপকর্ম করে বসতে পারে।

মুঠোফোনের মাধ্যমে

মুঠোফোনের অপব্যবহারের কারণে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। এমনকি, মুঠোফোনের সংযোগে টাকা রিচার্জ করতে গিয়েও মেয়েরা সংযোগ নম্বর দোকানে দিয়ে আসলে এলাকার বখাটেরা তা সংগ্রহ করে অকারণে বিরক্ত করে থাকে। এভাবে মেয়েরা বিড়ম্বনার শিকার হয়।

পাশ্চাত্যের অনুকরণ

আকাশ সংস্কৃতি ও ইন্টারনেটের প্রভাব সর্বপ্রথম তরুণ সমাজের উপর পড়ে। যেসব তরুণ ইন্টারনেট ব্যবহার করে এবং একান্ত গোপনে তা ব্যবহারের সুযোগ পায়, তাদের বিরাট অংশ বিভিন্ন পর্ণো সাইট দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে তাদের আচরণ বিকৃত হতে থাকে। অন্যদিকে স্যাটেলাইট টেলিভিশনের মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতা তরুণ সমাজের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ধর্মীয় রীতিনীতি। বাংলাদেশের নারী সমাজ ইতিবাচকভাবেই অনেক রক্ষণশীল। তবে ইদানিং আকাশ সংস্কৃতি, বিশ্বায়ন বা অন্য যে কোনো কারণে হোক নারী সমাজের অনেকের মধ্যে এক ধরনের তথাকথিত অগ্রসরমান আচরণ লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে পোশাক-পরিচ্ছদে কারো কারো অতিমাত্রায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা আমাদের সমাজ-সংস্কৃতিতে অনেক ক্ষেত্রেই অশালীন বলা হয়ে থাকে। সমাজে দু একজন এমন তথাকথিত অগ্রসর নারীর জন্য সমগ্র নারীসমাজ অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকির শিকার হচ্ছে।

শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিকতার অভাব

আমাদের দেশে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পর্যন্ত নীতিশিক্ষার কোনো পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। উচ্চশিক্ষায় কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এর প্রচলন আছে। শিশু, কিশোর ও তরুণ শিক্ষার্থীদের নীতিশিক্ষার পাঠ দেয়া হলে তাদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইভটিজিংয়ের মতো অনৈতিক কর্ম সম্পর্কে এদের মধ্যে যথেষ্ট সচেতনতা সৃষ্টি হবে। কারণ এ শিক্ষা সার্বিকভাবে মানুষের আচরণের ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত নিয়ে আলোচনা করে এবং নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়।

ইভটিজিং এর শিকার

বাংলাদেশে বখাটেদের শিকার হয়ে প্রতিনিয়ত ঘটছে নানা দুর্ঘটনা। পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা তুলে ধরা হলো–

কেস নং ১

নাফফিয়া আপন পিংকী (১৪), নবম শ্রেণীর ছাত্রী, শ্যামলী আইডিয়াল টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা। মুরাদ নামক এক বখাটে ছেলে প্রায়ই পিংকীকে উত্যক্ত করত। এক পর্যায়ে ১৯ জানুয়ারী ২০১০ তারিখে বখাটে মুরাদ তাকে মারধর করলে সে অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে।

কেস নং ২

ইলোরা (১৩), অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী, দক্ষিণ বনশ্রী মডেল হাই স্কুল, রামপুরা, ঢাকা। পাড়ার বখাটে কর্তৃক উৎপাতে আত্মহত্যা করে।

কেস নং ৩

রেশমা খাতুন (১৮), এইচ,এস,সির ছাত্রী, শালফা টেকনিক্যাল কলেজ, বগুড়া। মুন্নাফ ও রবিন নামে দুজন বখাটে ছেলের অত্যাচারে কীটনাশক পান করে আত্মহত্যা করেছে। রেশমার পরিবার থেকে মুন্নাফ ও রবিনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে কিন্তু আসামীরা পলাতক।

ইভটিজিং এর আইনগত প্রতিকার

বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় ইভটিজিং বন্ধ করতে বা এর প্রতিকারের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট আইন নেই। এমনকি প্রচলিত আইনের কোনো ধারায় 'ইভটিজিং' বলে কোনো শব্দ ব্যবহার হয়নি। তবে যৌন হয়রানিমূলক কাজকে আইনে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং তা শাস্তিযোগ্য। নারীদের বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন থেকে রক্ষার জন্য বাংলাদেশে বিক্ষিপ্ত কিছু আইন আছে। এ সকল আইনে নারী ও পুরুষের মৌলিক মানবাধিকারের ভিত্তিতে সম অবস্থানের বিধান রয়েছে এবং নারীর সকল প্রকার শারীরিক নির্যাতন, নিপীড়ন ও হয়রানি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।[৩] নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত) ২০০৩ এবং বাংলাদেশ দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (সংশোধিত) ২০০৪-এই দুটি আইনের মাধ্যমে ইভটিজিং এর প্রতিকার পাওয়া সম্ভব। পাশাপাশি মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশের মাধ্যমে বখাটেদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা প্রয়োজন।[৪]

সাংবিধানিক বিধান

১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার পরিচ্ছেদের ২৮ নং অনুচ্ছেদে ২ নং দফায় নারীর সম-অধিকার প্রদান করে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র ও জনজীবনের সর্বস্তরে নারীরা পুরুষের মতো সমান অধিকার ভোগ করবে।[৫]

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের বিধান

অথচ ব্যক্তিগত জীবনে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে এখনো আইনের প্রয়োগ যথাযথ নয়। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ আইন সংশোধনও হয়েছে অনেকবার। এতে অবশ্য শুধু শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু নতুন কোনো ধরনের নির্যাতন অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বরং নারীর সহিংসতা প্রতিকারের পথ সংকুচিত করা হয়েছে। কারণ ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১০(২) ধারায় যৌন নিপীড়নের সংজ্ঞায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে 'অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি' শব্দটি ২০০৩ সালের সংশোধনীতে বাদ দেয়া হয়েছে।[৬] এটি আইনটিকে যেমন দুর্বল করে দিয়েছে তেমনি ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিকারের সহজ পথও বন্ধ হয়ে গেছে।

বর্তমানে ২০০৩ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইনের ১০ ধারা অনুযায়ী অবৈধভাবে নারী ও শিশুর শরীরের কোনো অঙ্গ স্পর্শ করে শ্লীলতাহানী করলে তা যৌনপীড়ন হিসেবে গণ্য হবে এবং এর জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক ১০ বছর কিন্তু অন্যূন ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবেন। অর্থাৎ এই আইন মোতাবেক অশোভন বা অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করার প্রেক্ষিতে কোনো প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ নেই। শুধু অঙ্গ স্পর্শ করে শ্লীলতাহানী করলে তার বিরুদ্ধে এই আইনে প্রতিকার পাওয় যাবে।[৭]

বাংলাদেশ দণ্ডবিধি আইনে বিধান

১৮৬০ সালের বাংলাদেশ দণ্ডবিধি আইনেও নারীর হেফাজতমূলক ধারা সন্নিবেশিত আছে। এই আইনের ২৯৪ ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বিরক্তি উৎপাদন করে (১) কোনো প্রকাশ্য স্থানে কোনো অশ্লীল কাজ করে বা কোনো প্রকাশ্য স্থানে বা কোনো প্রকাশ্য স্থানের সন্নিকটে অনুরূপ অশ্লীল সংগীত, গাঁথা বা কথায় গান করে, আবৃত্তি করে বা উচ্চারণ করে, তাহলে সে ব্যক্তি ৩ মাস পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবে।[৮] এই আইনের ৩৫৪ ধারা অনুযায়ী নারীর শালীনতা নষ্ট করার অভিপ্রায়ে বা তার শালীনতা নষ্ট হতে পারে জেনে কোনো নারীকে আক্রমণ করা বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করা এই ধারায় অপরাধ। এ ধরনের অপরাধের শাস্তি হচ্ছে ২ বছর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড।[৯] যদিও 'শালীনতা' শব্দের কোনো সংজ্ঞা দণ্ডবিধিতে নেই। তবে যে আচরণ কোনো নারীর প্রতি শোভন, তার বিপরীত হলে তা অশালীন বলা যায়। এ ধরনের বিপরীত আচরণের সাথে যখন দৈহিকভাবে আক্রমণ বা বল প্রয়োগ করা হয় এবং আক্রমণকারী যখন স্বেচ্ছাকৃতভাবে বা জেনে শুনে তা করে তখন তা এই ধারায় বর্ণিত অশালীনের আওতায় আসে।

এছাড়া দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারায় কোনো নারীর শালীনতার অমর্যাদার উদ্দেশ্যে কোনো মন্তব্য, অঙ্গভঙ্গি বা কোনো কাজ করার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। এ ধারা মোতাবেক শাস্তির মেয়াদ ১ বছর বা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড।[১০] এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে যে সকল তথ্যাবলী প্রমাণ করতে হয় তা হলো– (১) অভিযুক্ত ব্যক্তি কোনো মন্তব্য, শব্দ, অঙ্গভঙ্গি, কোনো বস্তু প্রদর্শন, কোনো নারীর নির্জনবাসে অনধিকার প্রবেশ করেছিল; (২) অভিযুক্ত ব্যক্তি উল্লেখিত বিষয়ের যে কোনো একটি কোনো নারীকে শোনানো বা দেখানোর উদ্দেশ্যে করেছিল; (৩) এসবের দ্বারা কোনো নারীর শালীনতার অমর্যাদা করার উদ্দেশ্য ছিল। অতএব ইভটিজিং এর অপরাধের বিরুদ্ধে উপরোক্ত দুটি আইনে উল্লেখিত ধারায় মামলা করা সম্ভব।

হাইকোর্ট বিভাগের দিকনির্দেশনা

২০০৮ সালে যৌন হয়রানি রোধে বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি কর্তৃক রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ১৪ মে ২০০৯ তারিখে কয়েকটি দিক নির্দেশনা উল্লেখ করে একটি নীতিমালা প্রদান করেছেন। ইভটিজিং প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এটি একটি মাইলফলক রায়। সংসদে আইন পাস না হওয়া পর্যন্ত এটি মেনে চলা বাধ্যতামূলক।[১১] এই রায়ে যৌন হয়রানির সংজ্ঞায় শারীরিক বা মানসিক যে কোনো ধরণের নির্যাতন যৌন হয়রানির পর্যায়ে পড়ে। যেমনঃ ই-মেইল, মুঠো ফোন, এসএমএস, পর্ণোগ্রাফি, যে কোনো ধরনের চিত্র, অশালীন উক্তিসহ কাউকে অশালীন ইঙ্গিতপূর্ণ আচরণ এর মধ্যে পড়বে। কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে যে কেনো ধরনের অশ্লীল উক্তি, কারও দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকানো, কোনো নারীকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন, যে কোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ করা, যৌন সম্পর্ক স্থাপনের দাবি বা অনুরোধ, অন্য যে কোনো শারীরিক বা ভাষাগত আচরণ যার মধ্যে যৌন ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন-এগুলোও যৌন হয়রানির মধ্যে পড়বে।[১২] অর্থাৎ উচ্চ আদালতের এই রায়ে কর্মক্ষেত্র, রাস্তাঘাট ও সব ধরনের প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে "যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা, ২০০৮" নামক ৭টি অনুচ্ছেদ বিশিষ্ট খসড়া নীতিমালা তৈরীর কাজ চললেও তা ছিল শুধু উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক।

নারীর প্রতি সর্ব প্রকার বৈষম্য দূর করতে সিডো সনদ

১৯৮৪ সালে ৬ নভেম্বর বাংলাদেশ সরকার নারীর প্রতি সব বৈষম্য অপনোদন (সিডো) সনদের ৩০টি ধারা স্বাক্ষর করেছে। নারী-পুরুষের সমতা অর্থাৎ সমান সুযোগ নিশ্চিত করে নারীর প্রতি সকল ধরণের বৈষম্য দূর করতে সিডো সনদ বাস্তবায়ন জরুরি। সিডোর স্বাক্ষর দানকারী রাষ্ট্র হিসেবে সিডোর অনেক নীতিমালাই

বাংলাদেশের জাতীয় আইনে প্রতিফলিত হয়নি। যদিও আন্তর্জাতিক দলিলের মতো সিডোর নির্দেশনা সদস্য রাষ্ট্রের ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে না। তবে সদস্য রাষ্ট্রগুলো এই দলিলে স্বাক্ষর করার সঙ্গে সঙ্গে এই দলিলের নীতির সঙ্গে মিলিয়ে প্রচলিত আইন পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করে।[১৩] সে প্রেক্ষিতে নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন দূর করতে পরিপূর্ণ আইন প্রয়োজন।

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন (খসড়া), ২০১০

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইনের খসড়া এখন আইন মন্ত্রণালয়ে। আইনটিতে অভিযুক্ত পক্ষ একজন পুরুষ ও তার বিরুদ্ধে অভিযোক্তা একজন নারী নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই আইনের আওতা হচ্ছে সরকারি, বেসরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, ব্যক্তিমালিকানাসহ যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্র।

খসড়া আইনটিতে যৌন হয়রানি কোনগুলো, তার যে ব্যাপক সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, সেটি সন্তোষজনক। সংজ্ঞায় বলা হয়েছে–

> *"যৌন হয়রানি বলতে সরাসরি বা ইঙ্গিতে অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ, শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরনের প্রচেষ্টা, প্রাতিষ্ঠানিক বা পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে কারো সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা, যৌন ইঙ্গিতবাহী কোনো কিছু উপস্থাপন বা উক্তি বা মন্ত ব্য বা প্রদর্শন করা, যৌন আকাংখা পূরণের জন্য অনাকাংখিত বা গ্রহণযোগ্য নয় এমন আবেদন বা অনুরোধ করা, পর্ণোগ্রাফি দেখানো, যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য বা ইশারা করা, অশালীন অঙ্গভঙ্গি, অশালীন ভাষা বা মন্তব্যের দ্বারা উত্যক্ত করা বা অশালীন উদ্দেশ্য পূরণে কোনো ব্যক্তির অলক্ষ্যে নিকটবর্তী হওয়া বা অনুসরণ করা বা যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ ঠাট্টা বা উপহাস করা, চিঠি, টেলিফোন, বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস, কারখানা, ক্লাসরুম, ওয়াশরুম, বাথরুম বা যে কোনো স্থানে বা দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক কোনো কিছু লেখা বা অংকন বা চিহ্নিতকরণ বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোনো অশালীন বা যৌনতা সংশ্লিষ্ট কোনো বস্তু রাখা বা দেখানো ইত্যাদি, যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণে কমনরুম, ওয়াশরুম, বাথরুম বা এই ধরনের কোনো স্থানে উঁকি দেয়া, চরিত্রহননের উদ্দেশ্যে কারো স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণও সংরক্ষণ, প্রদর্শন, বিতরণ, বিপণন ও প্রচার বা প্রকাশ করা, লিঙ্গগত কারণে বা যৌন হয়রানির উদ্দেশ্যে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, প্রাতিষ্ঠানিক*

এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে বা বিরত থাকতে বাধ্য করা, প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হুমকি দেয়া বা চাপ প্রয়োগ করা, প্রতারণার মাধ্যমে ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা, যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণ সংশ্লিষ্ট কোনো কাজ করতে অস্বীকার করার কারণে কোনো ব্যক্তির পদোন্নতি বা পরীক্ষার যথাযথ ফল বা অন্য যে কোনো সুবিধাদি বাধাগ্রস্ত করা এবং যৌন প্রকৃতির যে কোনো প্রকার অনাকাঙ্ক্ষিত শারীরিক, বাচনিক বা ইঙ্গিতমূলক অভিব্যক্তি বোঝাবে।"[১৪]

ইভটিজিং প্রতিরোধে সামাজিক নৈতিকতা ও করণীয়

সব শ্রেণীর মানুষের কাছে ইভটিজিং এখন যেমন খুব পরিচিত শব্দ তেমনি এটি একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। কোনো একটি বিশেষ কারণ ইভটিজিংয়ের জন্য দায়ী নয়। ইভটিজিংয়ের মতো একটি সামাজিক ব্যাধি সহজেই নির্মূল হবে না। কেননা এ সমস্যাটি বহু দিনের। তাই আইনের বাস্তবায়নের পাশাপাশি সামাজিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা ফিরিয়ে আনতে হবে। কারণ এর শিকড় সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই মিশে আছে।

পরিবারের ভূমিকা

পরিবার হচ্ছে সর্বপ্রথম ও প্রধান ভিত্তি স্তর যেখান থেকে একটি শিশু সম্পূর্ণ মানুষরূপে গড়ে ওঠে। পরিবারে এক অন্যের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সম্মান ও মর্যাদার মনোভাব নিয়ে বেড়ে না উঠলে এর নেতিবাচক প্রভাব পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে পড়বেই। মূলত ইভটিজিং নির্মূলে পরিবারের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের ভেতর যদি ছেলেদের নৈতিক শিক্ষা দেয়া যায়, তবেই পরিবর্তন আশা করা যায়। শিশুর বেড়ে ওঠা ও সামাজিকীকরণের মধ্যেই নারীর প্রতি এই বিদ্বেষ ও সহিংস মনোভাব আত্মস্থ হয়ে পড়ে এবং তা ছেলে শিশুর ব্যক্তিত্বের অংশে পরিণত হয়। ঘরের ভেতরের পুরুষ চরিত্রের ধর্মবিহীন রূঢ় আচরণ বা নারীদের অপমান করার চিত্র পরবর্তীতে ছেলে শিশুটিও আশেপাশের কম শক্তিধর মানুষকে হেয় করার মানসিকতা নিয়ে বড় হতে থাকে। যে ছেলেটি মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে তার বিরুদ্ধে অভিভাবককে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অন্যদিকে বেশিরভাগ পরিবারের মেয়েরা মেনে নেয়া, কথা না বলা ও সিদ্ধান্তহীনতার চরিত্র ধারণ করে। তাই মেয়ের মা বাবা ইভটিজিংয়ে শিকার মেয়েটিকে শাসনের নামে মানসিক নির্যাতন না করে সাহস যোগাতে হবে যাতে সে সামনে এগিয়ে যেতে পারে। একটি মেয়ে যখন ইভটিজিংয়ের শিকার হয়, তখন তার পাশে পরিবারের সহায়ক ভূমিকা থাকতে হবে নতুবা অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

স্কুল, কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাযথ দায়িত্ব নিতে হবে। পড়ালেখার পাশাপাশি সমান গুরুত্ব দিয়ে তাদের মধ্যে নৈতিকতাবোধ এবং সহপাঠীদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তৈরী করে দিতে হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য তার যে দায়িত্ব বা ভূমিকা তা তাকে বোঝাতে হবে। সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ফলে ইভটিজিংয়ের মতো অনৈতিক কাজে সহজেই জড়িত হবে না।

দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর বেড়ে ওঠা ও সামাজিকীকরণ ঘটে নাজুকতার মধ্য দিয়ে, এর সুযোগ নেয় বখাটেরা। সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সব মানুষের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বাড়াবাড়ির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। রাষ্ট্র ও সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এই সমস্যা প্রতিহত করা সম্ভব হবে।

আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে হেলপ লাইন

ইভটিজিংয়ের শিকার হলে সহজেই যাতে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার সাহায্য নেয়া যায়, এ জন্য পর্যাপ্ত হেলপ লাইন থাকতে হবে। তবে যাদের বিরুদ্ধে নালিশ করা হবে, তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিচয় তথা ক্ষমতার দাপট যদি প্রবল হয়, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে পরবর্তী অবস্থা সামলানো একজন ভিকটিমের জন্য কঠিন হয়ে ওঠে। এ কারণে অনেকে বিষয়টি নীরবে সহ্য করে যায়। এমনকি আত্মহত্যার মতো দুঃখজনক ঘটনাও ঘটছে। তাই সামাজিকভাবে জোরালো ঐকমত্য সৃষ্টি করা দরকার, যাতে কোনো অভিভাবক, ক্ষমতাধর ব্যক্তি, কোনো কর্তৃপক্ষ যেন ইভটিজিংকারী বখাটেদের প্রশ্রয় না দেন। আইনশৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টা ধারাবাহিকভাবে কার্যকর থাকলে এ ধরনের অপরাধ এক সময় নির্মূল হয়ে যাবে আশা করা যায়।

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা

সমাজে এ ধরনের অপরাধীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া দরকার। আমাদের সমাজিক পরিস্থিতি এমনই যে আজও এখানে ইভটিজিংয়ের শিকার মেয়েরা মামলা করার বদলে সামাজিক মান-সম্মানের ভয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। ইভটিজিংয়ের মতো মেয়েদের প্রাণ সংহারক একটি গুরুতর অপরাধকে হালকাভাবে দেখার এবং দোষ মেয়েদের উপর চাপানোর প্রবণতাও আমাদের সমাজে দেখা যায়। তাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হলে পরবর্তীতে অন্য বখাটেদের দৌরাত্ম কমে আসবে।

আইনের বাস্তবায়ন

নারীদের বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন থেকে রক্ষার জন্য যত ধরনের আইন করা হয়েছে তা থেকে নারীরা কতটা সুফল পাচ্ছে– এ বিষয়টি নতুন করে ভাবা প্রয়োজন। তাই নারীর প্রতি নির্যাতন রোধে যে সকল আইন আছে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। মেয়েদের সব ধরনের হয়রানি রোধে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি অফিস এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপন ও তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে– এই মর্মে হাইকোর্ট বিভাগের দেয়া রায় রয়েছে, সে রায় আজও বাস্তবায়ন করা হয়নি। যতদিন পর্যন্ত ইভটিজিং প্রতিরোধে কোনো সুনির্দিষ্ট আইন তৈরী না হয় ততদিন পর্যন্ত প্রচলিত আইন ও হাইকোর্টের নীতিমালার সঠিক ও কঠোর প্রয়োগ সুনিশ্চিত করতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব ইভটিজিং প্রতিরোধে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়ন করতে হবে।

নৈতিক শিক্ষা

সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান। এ লক্ষে শিক্ষার সকল পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। ইভটিজিং বন্ধের ঘোষণা দেয়া হবে এবং অন্যদিকে শালীন পোশাক বনাম বোরকা পরার প্রতি অনীহা ও অবজ্ঞা সৃষ্টি করা হবে– তা তো হতে পারে না। কাজেই শিক্ষার সকল পর্যায়ে নৈতিক শিক্ষার বিকল্প নেই।

উপসংহার

নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। অথচ একজন নারীকে সমাজের কিছু বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ দ্বারা নিরাপত্তাহীন জীবন কাটাতে হচ্ছে, মূল্য দিতে হচ্ছে নিরপরাধ কিশোরীদের। নিঃসন্দেহে ইভটিজিং একটি মানবতাবিরোধী জঘন্য অপরাধ। একটি সভ্য রাষ্ট্রের জন্য ইভটিজিংয়ের মতো ঘটনা অত্যন্ত লজ্জাকর। রাষ্ট্রীয় আইন কাঠামোর গণ্ডিকে বাড়ানোর মাধ্যমে আমাদের মেয়েদের নিরাপত্তা বলয়কে শক্তিশালী করার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে।

সম্প্রতি ইভটিজিং প্রতিরোধে সমাজের বেশিরভাগ মানুষ সোচ্চার। এ লক্ষে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। সরকারের শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়েও নেয়া হচ্ছে অনেক কার্যকর পদক্ষেপ। সরকার ইভটিজিং বন্ধে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইভটিজিং বন্ধে আট সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির সভাপতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

অতিরিক্ত সচিব। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে, অসংখ্য বখাটে ছেলেদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালতও কাজ করছে কিন্তু তারা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশের অধীনে বখাটেদের গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব অপরাধী জরিমানা পরিশোধ করে খালাস পেয়ে যাচ্ছে। যদি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এবং দণ্ডবিধি আইনের অধীনে বখাটেরা আটক করা যায় এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া যায় তবে ইভটিজিং প্রতিরোধ কিছুটা হলেও সম্ভব হতো। ইভটিজিং প্রতিরোধ করতে আইনের কঠোর প্রয়োগের পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধও জোরদার করতে হবে। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সঠিক ও সুস্থ জীবন দর্শন ও পথের দিকনির্দেশনা দিতে হবে ছেলেদের। পারিবারিক সচেতনতা, আন্তরিক যত্ন এবং প্রয়োজনীয় অনুশাসনই দিতে পারে একটি সুস্থ তরুণ সমাজ। সুস্থ তরুণ সমাজ দিতে পারে একটি সমৃদ্ধ দেশ, জাতি ও ভবিষ্যৎ।

তথ্যনির্দেশ

[১] বানু মালেকা, *'ইভটিজিং রুখতে বর্তমান আইন সংশোধন করে ব্যাপক প্রচার প্রচারণায় যেতে হবে'*, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৮ মে, খ্রি.২০১০, পৃ.১

[২] *The Daily Star,* 19 May, 2010.

[৩] হোসেন সেলিনা, *'বাংলাদেশের মেয়ে-শিশু'*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, খ্রি. ১৯৯০, পৃ.১৫৩

[৪] সরকার, জাহাঙ্গীর আলম, 'আত্মহনন: বিচারের বাণী কি নিভৃতেই কাঁদবে?', *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ১১ মে, খ্রি.২০১০, পৃ.১৬

[৫] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৭২, অনুচ্ছেদ ২৮

[৬] নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০, (সংশোধিত ২০০৩) ধারা ৯(২)

[৭] নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩), ধারা ১০

[৮] বাংলাদেশ দণ্ডবিধি আইন, ১৮৬০, ধারা ২৯৪

[৯] বাংলাদেশ দণ্ডবিধি আইন, ১৮৬০, ধারা ৩৫৪

[১০] বাংলাদেশ দণ্ডবিধি আইন, ১৮৬০, ধারা ৫০৯

[১১] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০ মে, খ্রি. ২০০৯

[১২] হাফিজা শাপলা এবং সরকার চিত্তরঞ্জন, "ইভটিজিং স্পষ্টতই যৌন হয়রানি", *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৫ মার্চ, খ্রি. ২০১০, পৃ.১৬

[১৩] কামাল, সুলতানা, *'সিডও-র আলোয় নারীর সমঅধিকার'*, 'নারী ও সমাজ: সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে', [illegible] (সম্পাদনা), সূচীপত্র, ঢাকা, খ্রি. [illegible], পৃ.[illegible]

[১৪] গোলাম রব্বানী, মোহাম্মদ, "যৌন হয়রানি প্রতিরোধের প্রসঙ্গ", *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ১৪ অক্টোবর, খ্রি. ২০১০, পৃ.১৬

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮
বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৬, পৃষ্ঠা ১৩৯-১৫৪

ইসলামে বাল্যবিয়ে: ইসলাম ও বর্তমান সমাজ

মোহাম্মদ ইলিয়াছ ছিদ্দিকী*
মোহাম্মদ মুরশেদুল হক**

সারসংক্ষেপ: অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়া এদেশের নারী সমাজের জন্য একটা বড় ধরনের সমস্যা। এ অল্প বয়সের বিয়ে শুধু নারীর নিজের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তা নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যার উৎস হিসেবে বাল্যবিয়েকে অভিহিত করা হয়। বিশেষত নারী শিক্ষা, যৌতুক, আর্থসামাজিক দুর্দশা, নারী নির্যাতন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাল্যবিয়ে এক বড় ধরনের সমস্যার কারণ হিসেবে বিরাজমান। অশিক্ষা, প্রসূতিমায়ের অকাল মৃত্যু, পারিবারিক দ্বন্দ্ব কলহ, অপরিকল্পিতভাবে সন্তান জন্মদান, স্ত্রী নির্যাতনের মতো অনেক সমস্যা বাল্যবিয়েকে প্রকট করে বলে মনে করা হয়। আমাদের দেশ ও সমাজে বিরাজিত বহু সমস্যার মধ্যে বাল্যবিয়ে একটি সামাজিক সমস্যা। শত শত বছর ধরে চলে আসা আমাদের সমাজ ব্যবস্থার প্রথা হিসেবে টিকে আছে বাল্যবিয়ে। বহু আইন, রাষ্ট্র ও সমাজের অবিরত প্রচেষ্টাও বাল্যবিয়ে নিরোধে কাজে আসেনি। তবে একশ বা দু'শ বছর আগে অবস্থা যা ছিল সেই দুরবস্থার উত্তরণ বাল্যবিয়ের ক্ষেত্রেও কিছুটা লক্ষ করা যায়। ৯/১১/১৩ বছরের কোন শিশুকে বিয়ের পিঁড়িতে বসানোর আয়োজন সমাজে আজ সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু এখনো বাল্যবিয়ে অর্থাৎ আঠার বছরের কম বয়সী মেয়েদের এবং একুশ বছরের নীচে ছেলেদের বিয়ে দেয়ার চলছে। তবে সরকার, সমাজ, পরিবার ও অভিভাবকরা বাল্যবিয়ে নিরোধে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কিছুটা হলেও দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে শুরু করেছেন। বাল্যবিয়ে নিরোধে আইন আছে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সমাজে ছড়িয়ে আছে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গ্রামে গ্রামে ইউনিয়নে ইউনিয়নে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বাল্যবিয়ের হার যতটুকু কমা প্রত্যাশিত ও প্রয়োজন ছিল ঠিক তেমন অবস্থা বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে দৃশ্যমান নয়। বিয়ে সম্পাদনের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত দেশের নিকাহ রেজিস্ট্রাররা বাল্যবিয়ে নিরোধে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখছেন না। আজকের দিনে এ বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বাল্যবিয়ের পরিচিতি, বাল্যবিয়ে নিরোধ আইনে কার কি শাস্তি, কিভাবে

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

বাল্যবিয়ে ঠেকানো যায় তা পর্যালোচনা করা এবং সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা ও পরামর্শ তুলে ধরা প্রয়োজন। সরকার, সমাজ, পরিবারসহ দেশের বোদ্ধাশ্রেণীর ভূমিকা বাল্যবিয়ে নিরোধে কেমন হওয়া উচিত, বিয়ের বয়স এবং বাল্যবিয়ে নিরোধে আমাদের করণীয় কি এবং বাল্যবিয়ে প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি এ বিষয়ে আলোচনা করাই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।]

নবী করীম স. এর যুগে বাল্যবিয়ে ঃ নবী করীম স. নিজে ২৫ বছর বয়সে বিয়ে করেন এবং তিনি যাকে বিয়ে করেন উম্মুল মুমিনীন সেই খাদিজাতুল কুবরা রা.-এর বয়স তখন ৪০ বছর। একই সাথে তিনি তাঁর কন্যাদেরও পরিণত বয়সেই বিয়ে দেন। ফাতিমা রা.-এর বিয়ের প্রস্তাব এলে তিনি তাঁর বিয়ের বয়স না হওয়ার কারণে প্রথমবার ফিরিয়ে দেন এবং পরবর্তীতে বিয়ের বয়সে পা দিলে তিনি আলী রা.-এর সাথে তাঁর বিয়েতে সম্মতি দেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে এর ব্যতিক্রম হয়নি তা নয়। হয় তো প্রশ্ন জাগতে পারে, নবী করীম স. এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরাম যে বয়সের নারীদের বিয়ে করেছেন বা ঐ সময়ে যা ঘটেছে তা ঘটলে দোষের কি থাকতে পারে? শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের বিয়েতে অবশ্যই কোন বাঁধা নেই। নবী করীম স. তাঁর পবিত্র জীবনে যা করেছেন তার সবটাই ছিল ইসলামী জীবন বিধানের অংশ। সর্বক্ষেত্রে তিনি সর্বপ্রথম থেকে সর্বশেষ ব্যবস্থার চর্চা করে ইসলামের সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় বাল্যবিয়ে ঃ শাস্ত্রের বিধান যাই থাক প্রাচীন হিন্দু সমাজে বাল্যবিয়ে সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়। মেয়ের বয়স সামান্য একটু বেশী হয়ে গেলে সমাজে গেল গেল রব ওঠতো। হিন্দু সমাজে সাধারণত দশ বছর হবার আগেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত। এমন কি তিন চার বছর বয়সের মেয়ের বিয়ের ঘটনাও স্বাভাবিক ছিল। হিন্দু শাস্ত্রে আট বছরের মেয়েকে বিয়ে দেয়ার বিশেষ প্রশংসা করা হয়েছে। অপরপক্ষে মনুসংহিতায় বিধান রয়েছে, কোন মেয়ের মাসিক দেখা দেয়ার পর বিয়ে হলে সেই মাতাপিতাকে নরকে যেতে হবে।[১] প্রাচীন বাঙালী সমাজে সব চাইতে অগ্রসরমান ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। কিন্তু ঠাকুর পরিবারেও মেয়েদের নিতান্তই কম বয়সে বিয়ে দেয়া হতো। রবীন্দ্রনাথ তার জ্যেঠিমা সম্পর্কে বলেছেন, যশোহর গ্রাম থেকে নিতান্ত অল্প বয়সে অশিক্ষিত বাল্য অবস্থায় ঠাকুর বাড়ির বধূ হয়ে কলিকাতায় এসেছিলেন।[২] দ্বারকানাথ ঠাকুর বিয়ে করেছিলেন ১৫ বছর বয়সে। পাত্রীর বয়স ছিল ১১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালী প্রসন্ন সিংহ, রমেশচন্দ্র দত্ত সেকালের বিখ্যাত এ ব্যক্তিরা সবাই বিয়ে করেছিলেন তাদের বয়স

১৭ হবার মধ্যেই। তাদের পাত্রীদের বয়স ছিল আরো কম। বঙ্কিমচন্দ্র যাঁকে বিয়ে করেছিলেন তার বয়স ছিল মাত্র ৫ বছর। দেবেন্দ্রনাথ ও বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর স্ত্রীর বয়স ছিল ৬ বছর। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রীর বয়স ছিল ৭ বছর। বিদ্যাসাগরের ৮, কেশব সেনের ৯, শিবনাথ শাস্ত্রীর ১০ দশ আর রাজনারায়ণ বসুর স্ত্রীর বয়স ছিল ১১ বছর। বাল্য বিবাহে লোকাচার একটা বড় চাপ হিসেবে কাজ করতো। কারণ একটু বয়সে মেয়ের বিয়ে দিলে সমাজে রীতিমত নিন্দা করা হতো।[৩]

তৎকালীন সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী নিজে কম বয়সী মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন কিন্তু তাঁর সাহিত্যের অনেক অংশ জুড়ে বাল্যবিয়ের সকরুণ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের নায়ক নায়িকাদের সকলেরই অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল। 'একরাত্রি' ছোট গল্পের নায়ক পড়ালেখার পাঠ শেষ না করে বিয়েতে রাজি না হওয়ায় নায়িকার অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়। তার ভাষায়, *'এমন সময় আমার পিতা এবং সুরবালার পিতা একমত হইয়া সুরবালার সহিত আমার বিবাহের জন্য উদ্যোগী হইলেন। আমি পনেরো বৎসর বয়সের সময় কলিকাতায় পালাইয়া আসি, তখন সুরবালার বয়স আট এখন আমি আঠেরো। পিতার মতে আমার বিয়ের বয়স ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। দুই চারিমাসের মধ্যে খবর পাইলাম উকিল রামলোচন বাবুর সুরবালার বিবাহ হইয়া গিয়াছে'।*[৪]

বাল্যবিয়ে চালু থাকার ফলে বিয়ের ক্ষেত্রে নানা রকম অসঙ্গতি বিদ্যমান ছিল। অসম বয়সী নারী পুরুষের বিয়ে একটি বিষময় ফল। কম বয়সী মেয়ের সাথে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের বিয়ে সমাজে খুব একটা বেমানান মনে হতো না। আর তাই ঘুনে ধরা সমাজের এ অমোঘ বিধানের কোন প্রতিবাদ করেনি রবীন্দ্রনাথের মহামায়া। বাল্যবিয়ের ফলে সমাজে মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার ছিল অধিক। আঠারোতে তাদের সৌন্দর্য্য হ্রাস পেতো এবং ২৫ বছর বয়সে তাদের বার্ধক্য দৃষ্টিগোচর হতো। পুরুষদের অবস্থা কিছুটা ভিন্ন ছিল, যদিও ত্রিশ বছর বয়সের পরে তাদেরও একই অবস্থা হতো। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিদান গল্পের নায়িকার যে করুণ পরিণতি তা কি কম বয়সে বিয়ে হবার ফল নয়?

বিয়ের বয়স ঃ শিশু ও নাবালকদের মধ্যে সংঘটিত বিয়ে বাল্যবিয়ে। এখনও এদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় পার না হতেই ৫% মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। হাইস্কুল পেরোতে পারে ৩০% মেয়ে, অর্থাৎ ম্যাট্রিক পাশ করার আগেই ৭০ % মেয়েকে শ্বশুর বাড়িতে চলে যেতে হয়। সুতরাং উপরের হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে শিশু বয়সেই (জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সকল মানব সন্তানকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়। বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন ১৯২৯ অনুযায়ী এই সীমা মেয়েদের জন্য আঠার বছর ও ছেলেদের জন্য একুশ বছর।) এ দেশের ৭৫% মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। ফলে জাতি যেমন শিক্ষিত মা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে; তেমন

অল্প বয়সে বিয়ে ও যৌন মিলনের ফলে ঐ শিশু বধূটির নানা প্রকার শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়।

নিরোধ আইনের ২এর (ক) ধারায় বলা হয়েছে– 'শিশু' বা নাবালক বলতে ২১ বছর বয়সের নীচের একজন পুরুষ এবং আঠারো বছর বয়সের একরূপ একজন স্ত্রীলোক বুঝাবে।[৫]

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বাল্যবিয়েকে সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ লক্ষে বাল্যবিয়েকে নিষিদ্ধ করার প্রক্রিয়াও দেশে দেশে বিদ্যমান রয়েছে। ১৯৬২ সনে এ লক্ষে একটি আইন করা হয় Convention of consent to marriage minimum age of marriages। এখন পর্যন্ত ৩৬ টি দেশ এ Convention অনুমোদন করেছে, যার মধ্যে বাংলাদেশ নেই। এ Convention অনুযায়ী বাল্যবিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।[৬]

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন, ১৯২৯-এ দেখা যায়, বিয়ের পাত্রপাত্রীর পারস্পরিক বয়সের দিকটি দেখা, একটি নির্দিষ্ট বয়স সীমায় তাদের উপনীত হওয়া এবং সে সম্পর্কে উভয় পক্ষের সম্যক জ্ঞাত থাকা অত্যাবশ্যক। আইন যে বয়স নির্ধারণ করেছে সেই বয়সের (১৮ বছরের) কম বয়স্কা মেয়েকে যে পুরুষ (১৮ বছরোর্ধ) বিয়ে করেন সে পুরুষ আইনের চোখে অপরাধী। কিন্তু নারী অর্থাৎ যাকে পুরুষটি বিয়ে করেছেন তিনি অপরাধী নন।

ইসলামী আইনে বিয়ে চুক্তির জন্য বেশি বা কম কোন বয়সসীমা নির্ধারিত নেই এবং পাত্রপাত্রীর শুধু বয়স দেখার অপরিহার্যতা নেই। ইসলামী শরীয়ত কোথাও বলেনি যে, অল্প বয়সে বিয়ে করতে হবে। তবে এটা ঠিক যে, বর বা কনের দেখাদেখি ও তার সামগ্রিক দিক যাচাইকালে বয়সের দিকটিও রুচি ও চাহিদার অনুপাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেখা যেতে পারে।

এ দেশে আইন করে সর্ব প্রথম বিয়ে উপযুক্ততার বয়স নির্ধারণ করা হয় ১৯২৯ সালে। এরপর এ বয়স সংক্রান্ত আইনের রদবদল করা হয় কয়েকবার।

The child Marriage restrant act-১৯২৯-এ যথাক্রমে ১৬ ও ১৫ বছর বয়সী ছেলেমেয়ের বিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৬১ সালের the muslim family laws ordiance এ ১৮ ও ১৬ বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়ের বিয়ে নিষিদ্ধ হয়। ১৯৮৫ সনের ১৪ নং অধ্যাদেশে বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স (অর্থাৎ ছেলে ২১ বছর ও মেয়ে ১৮ বছর) অতিক্রম করলে পুরুষ ও নারীর বিয়ের অগ্রাধিকার জন্মে। এ অধিকার নারীপুরুষের সমান।[৭]

এ আইনের লক্ষ হচ্ছে, যাতে অল্প বয়সে ছেলেমেয়েদের বিয়ে না হয় তা নিশ্চিত করা। কিন্তু নির্ধারিত বয়সের নিম্নের বয়সের পুরুষ এবং নারীর মধ্যে শরীয়ত সম্মত

বিয়ে সম্পন্ন হলে সে বিয়ে অসিদ্ধ হবে না। বিয়ের সিদ্ধতা বা অসিদ্ধতা এ আইনের আওতা বহির্ভূত।

অতএব ঠিক কত বয়সে যে মেয়েদের বিয়ে দেয়া উচিত আর কত বয়সে উচিত নয়, তা নির্দিষ্ট করে বলা এবং এজন্যে কোন বয়স নির্দিষ্ট করে দিয়ে তার পূর্বে বিয়ে নিষিদ্ধ করে আইন জারী করা একটি জটিল ব্যাপার।

তা ছাড়া বিয়ে বলতে কি বুঝায়, তাও ভেবে দেখা প্রয়োজন। কেননা বিয়ে বলতে যদি স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলন ও তদুদ্দেশ্যে ঘর বাঁধা বুঝায়, তাহলে তা যে ছেলেমেয়ের পূর্ণ বয়স্ক হবার পূর্বে আদৌ সম্ভব হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। আর যদি বিয়ে বলতে শুধু আকদ ও ইজাব-কবুল বুঝায় তাহলে তা যে কোন বয়সেই হতে পারে। এমনকি দোলনায় শোয়া বা দুগ্ধপোষ্য শিশুরও হতে পারে তার পিতার নেতৃত্বে। ইসলামী শরীয়তে এ বিয়ে নিষিদ্ধ নয়।[১]

কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা এবং নবী করীম স. এর যুগে ও তাঁর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর ভিত্তিতে উপরোক্ত কথার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য।

ইমাম নববী বলেছেন– ইরাকী ফকীহগণের ভাষ্য মতে, ছোট্ট বয়সে বিয়ে দেয়া মেয়ে বালেগা হয়ে বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার অধিকার রাখে। তিনি আরও বলেছেন, ইমাম আওযায়ী,আবূ হানীফা ও পূর্ববর্তী ফকীহগণ বলেছেন, ছোট্ট মেয়ে বিয়ে দেয়া সব কর্তৃপক্ষের জন্যেই বৈধ। তবে সে যখন বালেগা হবে, তখন সে বিয়ে রক্ষা করা কিংবা ভেঙ্গে দেয়ার পূর্ণ ইখতিয়ার তার নিজের। ইমাম আবূ ইউসুফ অবশ্য এ মতের ভিন্ন মত পোষণ করেন।

এমতাবস্থায় ছোট্ট মেয়ে বিয়ে দেয়ার অনুমতি থাকায় মেয়েদের জন্যে কোন ক্ষতিকারক হবে না। বালেগা হলে পরে তার বিয়ের বহাল রাখা বা না রাখার প্রকৃত মালিক তো সে নিজেই। বিয়ের জন্যে ছেলেমেয়ের কোন বয়স নির্দিষ্ট করে দিয়ে ইসলাম পিতা বা গার্জিয়ানকে একটা বিশেষ বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ করেনি। এ হচ্ছে বিশ্বমানবতার প্রতি ইসলামের বিশেষ অনুগ্রহ। তবে অনেক ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন যে, বৈধ বিষয়েও প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যায়।

বর ও কনের পারস্পরিক বয়সের পার্থক্য : বর ও কনের বয়সের পার্থক্য ও সামঞ্জস্য সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এ সম্পর্কে প্রথম কথা এ যে, সাধারণভাবে এ দুয়ের খুব বেশী পার্থক্য হওয়া উচিত নয়। তাতে দাম্পত্য জীবনে অনেক ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। এ হচ্ছে সাধারণ অবস্থার কথা। আর ইসলামে এ সাধারণ অবস্থার প্রতিই দৃষ্টি রেখে বলা হয়েছে যে, বর-কনের বয়স সাধারণত সমান সমান হলেই ভাল হয়। ইসলামে বর ও কনের সমবয়সের বা কাছাকাছি বয়সের হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইমাম নাসাঈ তাঁর সুনানে এ সংক্রান্ত একটি অনুচ্ছেদ এর নামকরণ করেছেন, বাবু তাযাউউজিল মারআতি মিছলিহা ফীস সিন্ন সমান সমান বয়সের বর কনের বিয়ে

সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ।[১১] এরপর তিনি প্রতিপাদ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন– আবু বকর ও 'উমর রা. উভয়ই ফাতিমা রা. কে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এ প্রেক্ষিতে নবী করীম স. বললেন, সে তো কম বয়সী মেয়ে। এরপর তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব করেন হযরত আলী রা. অতঃপর রসূলুল্লাহ্ স. ফাতিমাকে আলীর সাথে বিয়ে দেন।[১২]

বিয়ে বয়সের এ সমতা উত্তম। তবে বর ও কনের স্ব স্ব চাহিদার ভিত্তিতে বয়সের স্বল্প কিংবা দীর্ঘ পার্থক্যও ইসলামে স্বীকৃত।

বাল্যবিয়ের কারণ ঃ আমাদের সমাজে বাল্যবিয়ের নানা প্রকার কারণ বিদ্যমান রয়েছে। বাল্যবিয়ে প্রকৃত অর্থে বন্ধ করতে হলে সেদিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। ইউ এন এফ পি এ এর সহযোগিতায় পরিচালিত মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক প্রকল্পের প্রশিক্ষণ বিষয়ক এক গবেষণা হ্যান্ড আউটে বাল্যবিয়ের যে সব কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তা হল–

১. মেয়ে শিশুর প্রতি অবহেলা;
২. প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও কুসংস্কার;
৩. মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ কম থাকা;
৪. বিয়ে আইন সম্পর্কে ধারণার অভাব;
৫. কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দায়মুক্তির আশা;
৬. পুরুষদের মধ্যে অল্প বয়সী মেয়ে বিয়ে করার প্রবণতা।[১৩]

সন্দেহ নেই, আমাদের সমাজে বিদ্যমান বাল্যবিয়ের গুরুত্বপূর্ণ কারণ এগুলোই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাল্যবিয়ের আরও যে সকল কারণ নিহিত রয়েছে, তা হলো–

ক. প্রকৃত ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব;
খ. সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা;
গ. অধিক সন্তান সংখ্যা;
ঘ. পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ইত্যাদি।[১৪]

অপ্রাপ্ত ও অপরিণত বয়সে ছেলে মেয়েদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের পেছনে বহু কারণ বিদ্যমান। সামাজিক কুসংস্কার, অশিক্ষা, অভাব-অনটন, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, পারিবারিক পর্যায়ে পিতামাতার অসচেতনতা ও ভ্রান্ত চিন্তাধারা-সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা বাল্যবিয়ের জন্য অনেকাংশে দায়ী। সাধারণত পরিবারের অভিভাবকের ধারণা হল ছেলে বা মেয়েকে যে কোনভাবে বিয়ে দিতে পারলেই হলো। ছেলে মেয়েদের বিয়ে দেয়া বা বিয়ে করানোর ক্ষেত্রে পিতামাতার জন্য অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের চেয়ে শখ পূরণই বেশী প্রাধান্য পায়। ছেলে কিংবা মেয়ের যথার্থ বুঝ-জ্ঞান হয়েছে কিনা, সংসারের সারবত্তা বুঝার ক্ষমতা তাদের আছে কিনা বহু অভিভাবকই বিষয়টি ভেবে দেখেন না। শখের বশে, টাকার জোরে কিংবা টাকার অভাবে বা লোভে পরিবারের ইচ্ছাতেই বহু বাল্যবিয়ে সংঘটিত হতে দেখা যায়। এ

ক্ষেত্রে সন্তানের মতামতের তোয়াক্কা না করে অভিভাবকের আগ্রহ, ইচ্ছা ও শখ পূরণের প্রতিযোগিতায় বাল্যবিয়ে যে বাড়ছে– সমাজের চারপাশে দৃষ্টি দিলে এর সত্যতাও মেলে। বাল্যবিয়ের অন্য একটি বড় কারণ হলো, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা মেয়ের ভবিষ্যত নিয়ে থাকেন দ্বিধাগ্রস্ত ও চিন্তিত। পরিণত বয়সে উপযুক্ত পাত্রের সাথে কন্যাকে বিয়ে দিতে পারবেন– এ নিশ্চয়তা ও ভরসা পিতামাতা পান না। ফলে যে কোনভাবে নিজেদের বিবেচনায় উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেছে, তা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না– এ মানসিকতার কারণেই অপরিপক্ক কন্যাকে বিয়ে দেয়ার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেন স্বয়ং পিতামাতা। অনেক সময় অভিভাবকের অমতে-অজান্তে ছেলে-মেয়েরা নিজেদের ইচ্ছায় বাল্য বয়সে বিয়ে করার নজিরও দেখা যায়। দরিদ্র পরিবারেই এ প্রবণতা বেশি। এ যখন সমাজের অবস্থা বাল্যবিয়ে নিরোধ তখন কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া আমাদের সমাজে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে আইনি বিষয়ে সচেনতা এখনো গড়ে ওঠেনি। একদিকে আইন সম্পর্কে মানুষের ধারণা নেই, অন্যদিকে সর্বসাধারণকে আইন জানানোর বুঝানোর সঠিক কার্যকর কোন ব্যবস্থা না থাকায় অজ্ঞতার ফলে অনেকেই বাল্যবিয়ের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। সামাজিক প্রথা ও কুসংস্কার জিইয়ে থাকাও বাল্যবিয়ে নিরোধে বড় বাধা তো আছেই। মেয়েদের প্রতি অবহেলা ও পড়াশুনার যথেষ্ট সুযোগ না থাকায় তারা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের আগেই অসময়ে শিক্ষাঙ্গন থেকে ঝরে পড়ে। ফলে অযথা ঘরে বসিয়ে না রেখে অভিভাবকরা কন্যাকে বিয়ে দিয়ে দেয়াই উত্তম মনে করেন। এ কারণেও মেয়েরা বাল্যবিয়ের শিকার হয়। ইদানীং স্কুল-কলেজ পড়ুয়া মেয়েরা ইভটিজিং তথা বখাটে যুবকদের দ্বারা উত্যক্ত, হামলা-খুন ও অপহরণের ঘটনার মুখোমুখি হবার করুণ দৃশ্য সংবাদপত্র খুললেই চোখে পড়ছে। নিরাপত্তার কথা ভেবে তখন অভিভাবক বখাটেদের হাত থেকে বাঁচাতে মেয়েকে আর শিক্ষাঙ্গনে পাঠান না-এটা আজ সমাজের অসুস্থ কালচার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেয়ের পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হওয়া নিরূপায় অভিভাবক অসময়ে কন্যাকে বিয়ে দিচ্ছেন–এ সমাজ বাস্তবতাও বাল্যবিয়ের বড় কারণ।

বাল্যবিয়ে নিরোধে যা আমাদের করণীয় বা প্রস্তাবনা

১. বাল্যবিয়ে নিরোধে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত ও আইনের দুর্বলতাসমূহ দূর করতে হবে। ১৯২৯ সনের বাল্যবিয়ে নিরোধ আইনের অস্পষ্টতা ও অসামঞ্জস্য দিকগুলো যা পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে 'দূর করে বিদ্যমান আইনকে বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সরকারকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। নিকাহ রেজিস্ট্রাররা বাল্যবিয়ে আয়োজনে কোনভাবে সম্পৃক্ত না হওয়া সত্ত্বেও পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হয়রানি ও বাঁধার মুখোমুখি হচ্ছেন। সম্পাদিত যে কোন বিয়ে নিবন্ধনে যেহেতু নিকাহ রেজিস্ট্রার আইনগতভাবে বাধ্য,

তাই বাল্যবিয়ে নিবন্ধনে তিনি অসম্মতি জানালে আইনী দুর্বলতার কারণে অন্য কোথাও গিয়ে বিয়ে রেজিস্ট্রির সুযোগ নেন অনেকেই। বিধি সংশোধন করে এ সুযোগ বন্ধ করতে হবে। বর ও কনের স্থায়ী বাসিন্দা এলাকার সংশ্লিষ্ট নিকাহ রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে বিয়ে নিবন্ধনের আইনী বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে। নোটারি পাবলিকের হলফনামার মাধ্যমে বাল্যবিয়ে প্রথা বন্ধ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হলে বাল্যবিয়ে নিরোধ হতে পারে। অনিবন্ধিত বিয়ের জন্য নিকাহ রেজিস্ট্রারকে শাস্তি পেতে হয়। আবার তা বাল্যবিয়ে হলেও নিকাহ রেজিস্ট্রারকে নিবন্ধন করতে হচ্ছে আইনী নির্দেশনা ও প্রভাবশালীদের চাপে। তাই বাল্যবিয়ে নিবন্ধনের দায়দায়িত্ব ও শাস্তি থেকে নিকাহ রেজিস্ট্রারদের মুক্ত করতে হবে। যাদের আয়োজনে, আগ্রহ, ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তে বাল্যবিয়ে সম্পাদিত হয় ওই বিয়ের জন্য শুধু সংশ্লিষ্টরাই শাস্তি পাবেন এবং এ ধরনের বাল্যবিয়ে নিবন্ধনের দায়দায়িত্ব ও শাস্তি থেকে নিকাহ রেজিস্ট্রারকে নিস্কৃতি দেয়ার আইনী পদক্ষেপ নিতে হবে।

২. দারিদ্র্য ও আর্থিক অভাব-বঞ্চনা বাল্যবিয়ের জন্য দায়ী। দরিদ্র পিতামাতা ছেলেকে উপযুক্ত সময়ের আগেই বিয়ে করাতে চান। বউ ঘরে আনলে নগদ টাকা ও নানা আসবাব পত্র পাওয়া যাবে এ আশায় দরিদ্র পরিবারে বাল্যবিয়ের হার বেশী। তাছাড়া দেশে বেকারত্ব প্রকট হওয়ায় কনের পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা নিয়ে ছেলেরা চাকরী-ব্যবসার সুযোগ নিতে চায়। তাই বেকারত্ব ও দারিদ্র্য ঘুচানো না গেলে বাল্যবিয়ের অভিশাপ হতে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন।

৩. বাল্যবিয়ে নিরুৎসাহিত ও নিরোধে দেশের প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা এবং উপজেলা ও ইউনিয়নে প্রশাসনের উদ্যোগে এলাকার শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, মসজিদের ইমাম, সংশ্লিষ্ট এলাকার নিকাহ রেজিস্ট্রারসহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে বাল্যবিয়ে নিরোধ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এ কমিটি দুই মাস পরপর বৈঠক করে প্রতিটি এলাকার জনগণের মধ্যে বাল্যবিয়ের কুফল, বাল্যবিয়ে নিরোধে সচেতনতা ও জনমত গঠনে ভূমিকা রাখবে। মসজিদের ইমাম ও খতীব সাহেব জুমআর খুতবায় বাল্যবিয়ের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরবেন। এ ব্যাপারে ইসলামিক ফাউন্ডেশন তাঁদের দিক-নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় লিফলেট, ফেস্টুন, ব্যানার, নির্দেশিকা বিতরণের ব্যবস্থা করবে উক্ত কমিটি। বাল্যবিয়ে নিরোধ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও গতিশীল করতে কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে কেন্দ্রীয়ভাবে বাল্যবিয়ে নিরোধ কমিটি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে। বাল্যবিয়ে বিরোধী প্রচারপত্র, লিফলেট সকল পর্যায়ের শিক্ষাঙ্গনে ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহে বিলি এবং প্রয়োজনে নির্দেশিকা হিসেবে স্থায়ীভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. সুনির্দিষ্ট বিষয়ে জনমত ও জনসচেতনতা গড়ে তুলতে দেশে বিভিন্ন দিবস উদযাপিত হয়ে আসছে। তেমনি বাল্যবিয়ের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বাড়াতে বাল্যবিয়ে নিরোধ দিবস নামে বছরের একটি দিনকে সুনিদির্ষ্ট করে ঐ দিন সারা দেশে সরকারী, বেসরকারী পর্যায়ে সাড়ম্বরে পালনের ব্যবস্থা করা যায়। ঐ দিন সকল শিক্ষাঙ্গনে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে । এ দিবসটিতে অন্যান্য দিবসের মত সংবাদপত্রেও বিশেষ ক্রোড়পত্র, প্রবন্ধ-নিবন্ধ-ফিচার প্রকাশ ও টিভি চ্যানেলে নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করা যায়। এভাবে সভা-সমাবেশের মাধ্যমে বাল্যবিয়ে নিরোধ প্রচারণায় যথেষ্ট সাড়া ও সাফল্য আসতে পারে।
৫. বাল্যবিয়ের কুফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে এ বিষয়ে বিশেষ নিবন্ধ সংযোজন করা প্রয়োজন। সরকার এ ব্যাপারে কাঙ্ক্ষিত উদ্যোগ নিতে পারে।
৬. বহু বিষয়ে নানা দাবি আদায়ে রাজনৈতিক দলগুলো সবসময় মুখর থাকলেও বাল্যবিয়ে রোধে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও অঙ্গীকার দুঃখজনকভাবে অনুপস্থিত। এ জন্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সদিচ্ছা ও জোরালো ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
৭. বাল্যবিয়ের সাথে যৌতুকের নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। যৌতুকের লোভে বহু বাল্যবিয়ে হয়ে থাকে। তাই যৌতুক বিরোধী আইনের কঠোর প্রয়োগ করে যৌতুকজনিত বাল্যবিয়ের রোধ করতে হবে।
৮. গণশিক্ষা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তির আওতা বাড়েনি। উপবৃত্তির টাকা তাও যথাসময়ে ঠিকভাবে বন্টন না হওয়ায় মেয়ে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা থেকে ঝরে পড়ছে। সকল এলাকায় শিক্ষার সমান সুযোগ সৃষ্টি করে এবং অভাব-অনটনে জর্জরিত, অনিরাপত্তাসহ নানা কারণে ঝরে পড়ার আশংকা থাকা মেয়েদের শিক্ষাঙ্গনে ধরে রেখে তাদেরও উচ্চ শিক্ষা ও স্বাভাবিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হলে বাল্যবিয়ে অনায়াসেই হ্রাস পাবে।
৯. বাল্যবিয়ের কুফল নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র তৈরী করা।

উপসংহার

আমাদের আলোচ্য সময়ে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে বাল্যবিয়ের প্রথা ব্যাপকহারে ছিল তা বলা যায়। লক্ষণীয় যে, বাল্যবিয়ের প্রথা শুধু বাংলা নয়, এটি বৃহত্তর ভারতীয় সমাজেই সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। উনিশ শতক অবধি বাল্যবিয়ের রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং আইন প্রণয়নের ফলে এর ব্যাপকতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। ক্রমান্বয়ে এ সামাজিক ব্যাধি নিরাময় হচ্ছে তবে এখনো এসব প্রথার উপস্থিতি এবং মাত্রা দুর্লক্ষ্য নয়। নারী পুরুষের মধ্যে বিয়ের আয়োজন ধর্মীয় রীতিনীতি পালন

করাসহ পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব ও প্রাণপ্রবাহ চলমান রাখতেই বিয়ে বা দাম্পত্য জীবনকে গ্রহণ ও বরণ করতে হয়। পরিপূর্ণ বুদ্ধিদীপ্ত শারীরিক মানসিক যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়াই বিয়ের পূর্বশর্ত। শারীরিক উপযুক্ততা, মানসিক সবলতা আসেনি অপরিপক্ক এমন কোন ছেলেমেয়ের বিয়ে সমীচীন নয়। ইসলামের নির্দেশনাই হচ্ছে বিয়ের জন্য বালেগ বা পরিপক্ক হওয়া। বিয়ের জন্য অনিবার্যভাবে সঠিক যৌক্তিক বয়সে উপনীত হওয়া চাই। জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সুস্থ জীবনদৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গিও পরিপক্কতা আসে বয়সের দ্বারা। তাই, নারী পুরুষ দু'জনই পরিপক্ক, স্বাবলম্বী, শারীরিক-মানসিকভাবে উপযুক্ত হলেই বিয়ে বন্ধনের অনুমতি দেয় ইসলাম। নবী করীম স. ২৫ বছর বয়সে প্রথম বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী খাদিজা রা. ছিলেন একজন পরিপক্ক পরিপূর্ণ নারী। নবী কন্যা ফাতেমা রা.কে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন পরিণত বয়সে। নবী পরিবারের বৈবাহিক জীবনধারা মুসলিম সমাজে অনুসৃত হলে অপরিণত বয়সে বিয়ে প্রবণতা থেকে দেশ ও সমাজ মুক্ত হতে পারবে।

তথ্যনির্দেশ

[১] মুরশিদ, গোলাম, *হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতি,* ঢাকা : অবসর প্রকাশনা সংস্থা, খ্রি. ২০০৬, পৃ.২১৯

[২] হোসেন, কামালুদ্দীন, *রবীন্দ্রনাথ ও মোগল সংস্কৃতি,* ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. খ্রি. ১৯৯৮, পৃ.১৮৮

[৩] মুরশিদ, গোলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.২২০

[৪] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী* ঢাকা : ঐতিহ্য, খ্রি. ২০০৪, খ.৯, পৃ.৩১৯

[৫] বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯, ধারা ২ (ক) ; জামাল, মাহমুদ, *ইসলামে নারীর পারিবারিক অধিকার,* ঢাকা : প্রফেসর'স বুক কর্ণার, খ্রি. ২০০৭, পৃ. ১০০-১৫০

[৬] হক, নাঈমা, *বিয়ে ও নারীর মানবাধিকার,* ঢাকা : গুঞ্জন নারীপক্ষ, খ্রি. ২০০৩ সংখ্যা-১১তম, পৃ.১০-২১

[৭] আজাদ, মুহাম্মদ আবুল কালাম, "বিবাহপূর্ব কনে দেখার বিভিন্ন দিক ঃ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি", *ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল* অব ড. *সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, খ্রি. ২০০৬ পৃ.৮৫-১১৪

[৮] রহমান, গাজী শামছুর, *নারী প্রসঙ্গে বাংলাদেশের আইনের ভাষ্য*

[৯] আস-সাবাঈ, ড. মুস্তফা, *আল মারআতু বাইনাল ফিকহী ওয়াল কানুন,* তা.বি. পৃ.৫৭

[১০] রহীম, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন,* ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, খ্রি. ২০০৬ পৃ. ১২৯-১৩৫

[১১] নাসাঈ, *আসসুনান,* দেওবন্দ : মাকতাবা আশরাফিয়া, ইউ,পি. তা.বি. খ.২, পৃ.৫৮

[১২] প্রাগুক্ত

[১৩] *মানব সম্পদ উন্নয়নে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ প্রকল্পের প্রশিক্ষণের গবেষণা হ্যান্ড আউট,* খ্রি.২০০৩, পৃ.১২

[১৪] জামাল, মাহমুদ, *ইসলামে নারীর পারিবারিক অধিকার,* ঢাকা : প্রফেসর'স বুক কর্ণার, খ্রি. ২০০৭, পৃ. ১০০-১২৬

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার নিয়মাবলী

১. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দুই কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে জমা দিতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় কিবোর্ড ব্যবহার করে (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2000) টাইপ / ফন্ট Sutonny MJ ব্যবহার করতে হবে। কাগজের সাইজ A4। প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন থাকবে : উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১.৬৫ ইঞ্চি, বামে ১.৬ ইঞ্চি। প্রবন্ধের সফ্ট কপি সংস্থার ই-মেইল ঠিকানায় মেইল করে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে লেখকের পেশাগত পরিচয় ও ঠিকানা থাকতে হবে।

২. প্রত্যেক প্রবন্ধের সাথে লেখককে/দের এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে :

ক) জমাদানকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/তাঁরা;

খ) প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোনো জার্নাল-এ মুদ্রিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য তা অন্য কোনো জার্নালে জমা দেয়া হয়নি;

গ) প্রবন্ধে প্রকাশিত তথ্য ও তত্ত্বের সকল দায়-দায়িত্ব লেখক/গবেষক বহন করবেন।

৩. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোন পাণ্ডুলিপি ফেরত দেয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক জার্নাল-এর ২ (দুই) টি কপি এবং ৫ কপি অফপ্রিন্ট বিনা মূল্যে পাবেন। একক লেখকের প্রবন্ধ অগ্রাধিকার পাবে।

৪. প্রবন্ধ বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসরণে (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান) রচিত হবে। তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

৫. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন হবে না। লেখক কোনো বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে। টীকা ও বক্তব্যের উৎস উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে দিতে হবে। তথ্য নির্দেশের ক্ষেত্রে শব্দের উপর সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন[১]) সংখ্যা ব্যবহার করাই নিয়ম। তথ্যসূত্র সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার নিচে উল্লেখ করতে হবে। গ্রন্থ ও জার্নাল থেকে তথ্যসূত্র এভাবে লিখতে হবে।

যেমন- গ্রন্থ :

১. এবাদুল হক, কাজী, *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, খ্রি.১৯৯৮, পৃ.২৯

২. ইবনে হাযম, *আল মুহাল্লা*, আল-কাহেরা : মাকতাবা দারুত্তুরাস, খ্রি.২০০৫, খ.১, পৃ.৯০

৩. হুসাইন, যিকরা তাহা, *জামহুরিয়াতু মিসর আলআরাবিয়্যাহ*, ওযারাতুস সাকাফা, আলকাহেরা : আল-মাকতাবাতুল আরাবিয়্যাহ, খ্রি.১৯৭৭, পৃ.১০৩

প্রবন্ধ ঃ

১. Monsoor, Dr. Taslima, Dissolution of Marriages on Test; A Study of Islamic Family Law and Women, *Journal of the Faculty of Law*, University of Dhaka, Volume:15, Number:1, June 2004, p. 26

৬. মূল পাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি ৩০ শব্দের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। গ্রন্থ ও পত্রিকার নাম বাঁকা অক্ষরে (Italic) হবে যেমন, গ্রন্থ ঃ *বিচারব্যবস্থার বিবর্তন;* পত্রিকা : *Journal of islamic law and judiciary.*

৭. কুরআনুল করীম ও হাদীসের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত কুরআনুল করীম ও হাদীসসমূহের অনুবাদ অনুসরণ করতে হবে। কুরআনুল করীমের উদ্ধৃতিতে অবশ্যই হরকত দিতে হবে। কুরআনের উদ্ধৃতি হবে এভাবে– আল কুরআন, ২:১৫। হাদীসের উদ্ধৃতি হবে এভাবে– বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ,* অধ্যায়:--, অনুচ্ছেদ:---, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান:---, প্রকাশকাল---, সংস্করণ--- খ.--, পৃ.। এছাড়া যে সকল প্রবন্ধে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি দেয়া হবে সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় তার অনুবাদ দিতে হবে।

৮. প্রকাশিত প্রবন্ধের ব্যাপারে কারো ভিন্ন মত থাকলে যুক্তিযুক্ত, প্রামাণ্য ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

৯. প্রবন্ধের শুরুতে 'সারসংক্ষেপ' এবং শেষে 'উপসংহার' দিতে হবে।

১০. কুরআন ও হাদীসের আরবী Text নিচে তথ্যপঞ্জিতে এবং অনুবাদ মূল লেখার সাথে দিতে হবে।

প্রবন্ধ প্রেরণের ঠিকানা
সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, নোয়াখালী টাওয়ার (স্যুট-১৩/বি), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন :০২-৭১৬০৫২৭, ০১৭১২-০৬১৬২১, ০১৭১৭-২২০৪৯৮
ই-মেইল: islamiclaw_bd@yahoo.com

REGD. NO. DA. 237(1) ISLAMI AIN O BICHAR : OCTOBER - DECEMBER : 2010. Tk. 100